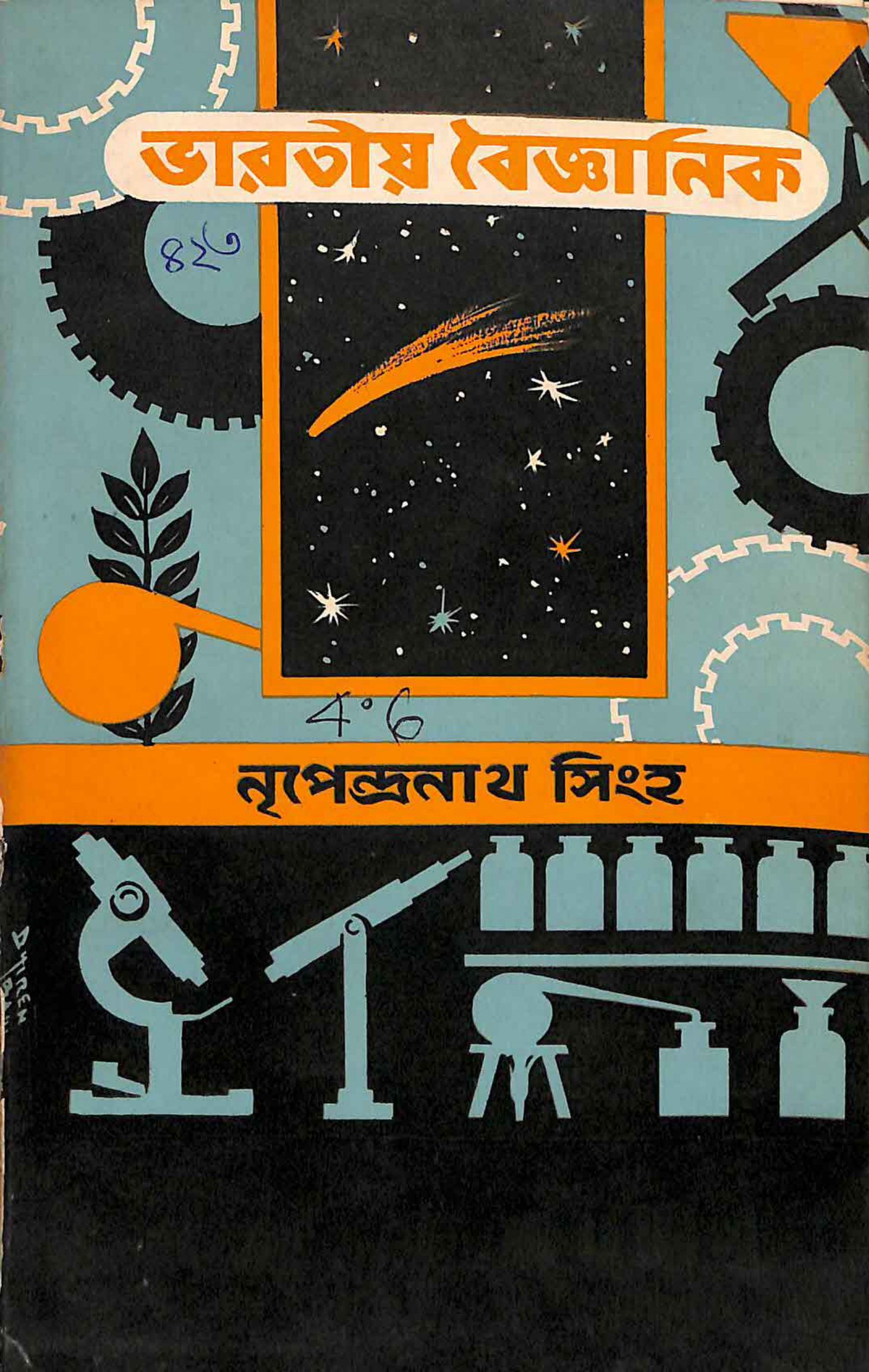

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক
৪২৬
4·6
নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ

# ভারতীয় বৈজ্ঞানিক

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education
as a Text Book on Bengali Supplementary Reader for Class VII
*Vide* Notification No. TB/76/8/SRB/33 dt. 31. 12. 76



শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সিংহ



ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ৭

## সূচীপত্র

স্কুলপাঠ্য অনুমোদিত সংস্করণ : ১৯৭৭
দাম : ৩·৫০ মাত্র



শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ৭
হইতেপ্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ,
ক্ষুদিরাম বসু রোড কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

# নিবেদন

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। ভারত যতদিন বৃটিশের অধীনে ছিল, ততদিন ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ সুবিধা ও উৎসাহ পায় নাই। প্রাচীন ভারত বিজ্ঞান-চর্চায় যে খুব উন্নত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুযোগ পাইলে ভারতবাসী নিজের গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব যে অর্জন করিতে পারে, তাহার প্রমাণ আচার্য জগদীশচন্দ্র, সি. ভি. রমন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ।

স্বাধীন হইবার পর ভারত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যতদূর সম্ভব প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সামান্য আভাস দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক ভারতে যে সব বৈজ্ঞানিক জগতে সুনাম অর্জন করিয়াছেন, সকলের জীবনী দেওয়া সম্ভব হয় নাই। নানা পুস্তক ও পত্রিকা হইতে পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকখানি বিজ্ঞান সম্পর্কে অণুসন্ধিৎসা জাগাইবার জন্য পাঠ্য পুস্তক-রূপে গৃহীত হইলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি

বিনীত
গ্রন্থকার

# ভারতীয় বৈজ্ঞানিক

## ভারতে বিজ্ঞানচর্চা

### প্রাচীন ও আধুনিক

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এখন আর মানুষ গুহার মধ্যে বাস করে না, পাথর ঠুকিয়া আগুন উৎপাদন করে না, তীর ধনুক দিয়া যুদ্ধ করে না, টোটকা ঔষধ খায় না। ভগবান মানুষকে একটি জিনিস দিয়া অপর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা হইল তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি ও বিচারশক্তিবলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিজের কাজে লাগাইতেছে। মানুষ এঞ্জিন আবিষ্কার করিয়া স্থলে রেলগাড়ীতে ও মোটরগাড়ীতে, উড়োজাহাজ আবিষ্কার করিয়া অন্তরীক্ষে এবং বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কার করিয়া জলে অতি দ্রুতগতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াত করিতেছে। মানুষ টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করিয়া মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে, পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া নিমেষের মধ্যে অপর প্রান্ত হইতে প্রেরিত গান ও সংবাদ রেডিওর সাহায্যে শ্রবণ করিতেছে; বন্দুক, কামান, বিষবাষ্প, অ্যাটম বোমা, দিয়া যুদ্ধ করিতেছে; বিদ্যুতের সাহায্যে কল-কারখানা চালাইতেছে, ঘর আলো করিতেছে; নদীর উপর বিরাট সেতু নির্মাণ করিয়া, পাহাড় কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে; নানারূপ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া রোগ নিরাময় করিতেছে; কৃত্রিম সার দিয়া জল সেচন করিয়া প্রচুর ফসল উৎপাদন করিতেছে।

সুদূর অতীতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও বহুদিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গতি মন্থর ছিল। গত একশত বৎসর যাবৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার খুব দ্রুতগতিতে চলিতেছে। শত-সহস্র আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞান বর্তমান যুগে পৃথিবীর রূপ এরূপভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে যে, শত বৎসর পূর্বে মৃত কোন লোক হঠাৎ জীবন লাভ করিয়া যদি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তবে সে এই পৃথিবীকে চিনিতে পারিবে না।

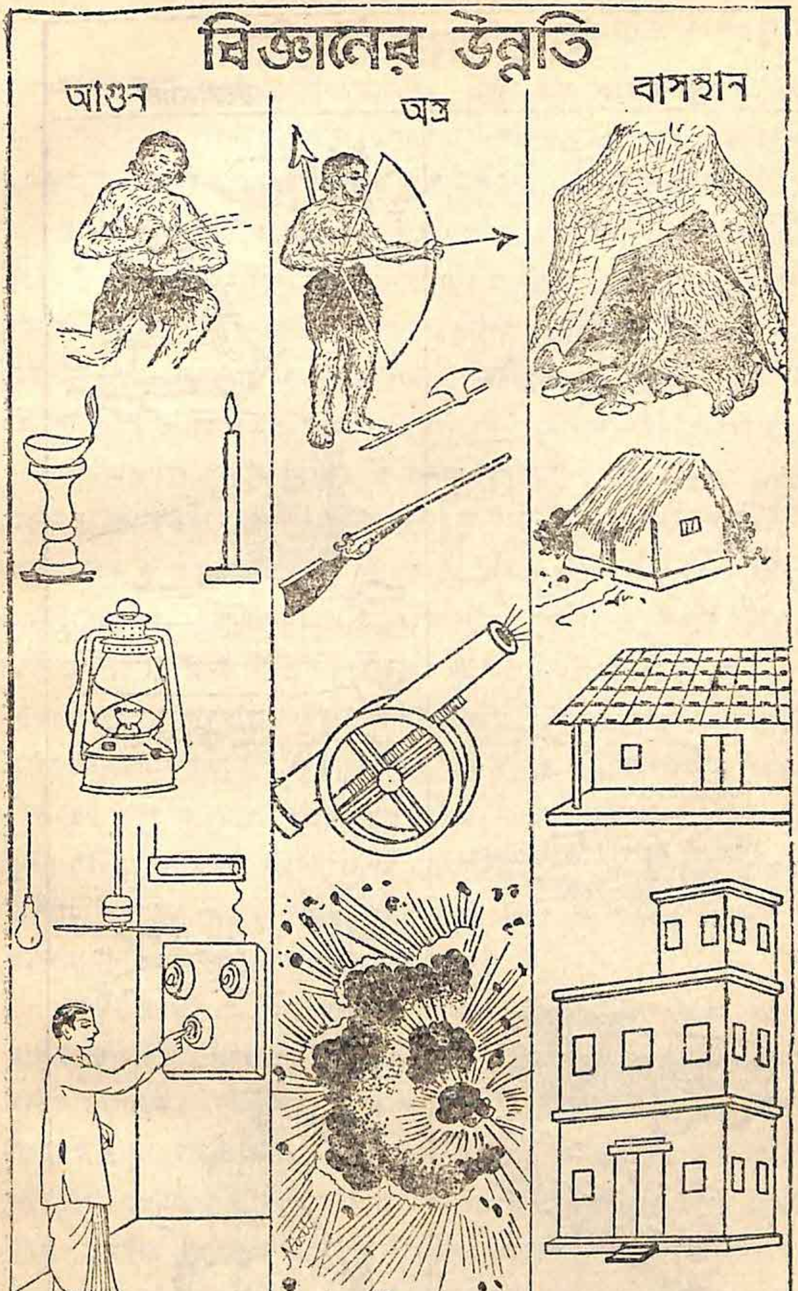
বর্তমান যুগে বিজ্ঞানচর্চা অসাধারণ সাফল্য লাভ করিলেও

প্রাচীন ভারত যে বিজ্ঞানানুশীলনে খুব উন্নত ছিল, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে বর্তমান জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারত পৃথিবীকে শুধু বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, দর্শনা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জ্ঞানই দান করে নাই, পরন্তু ভারত আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও দান করিয়াছে। এক আয়ুর্বেদেরই নানা শাখা আছে, যথা—শল্যতন্ত্র ( surgery ), কায়-চিকিৎসা ( practice of medicine ), মানস রোগ ( mental disease ) চিকিৎসা, চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা ( children's disease ), শারীর বিদ্যা ( physiology ) অর্থাৎ শরীর গঠনতত্ত্ব, দ্রব্যগুণ ( materia medica ), রসতন্ত্র ( use of metals )। সেকালেও ধাতব ঔষধ ও বনৌষধ—দুই প্রকার ঔষধই ব্যবহৃত হইত।

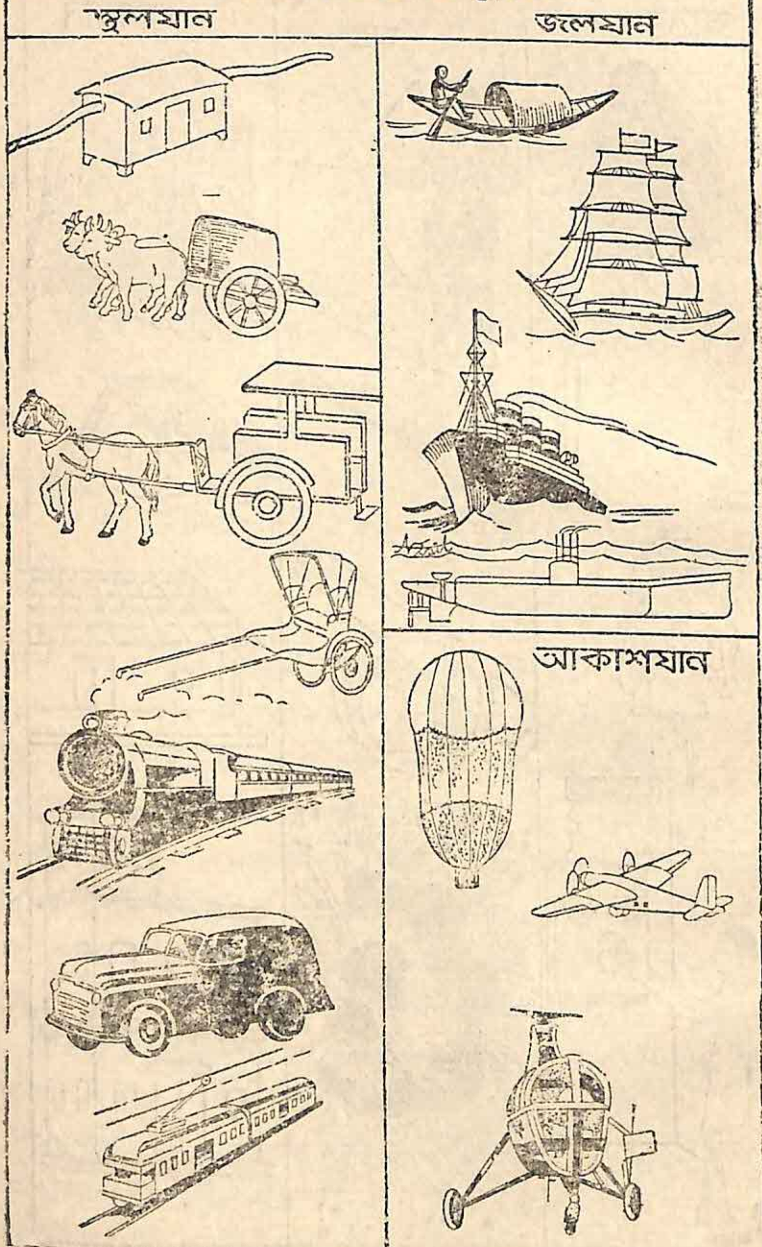
চরক, সুশ্রুত, জীবক প্রভৃতি বৈদ্যগণ এই চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক সংস্কার করেন আজকাল যেমন পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ আছেন, পূর্বকালেও সেইরূপ আয়ুর্বেদের বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন, যেমন কায়চিকিৎসক ( physician ), শল্যবিদ্ ( surgeon ), বিষচিকিৎসক ( toxicologist )। আয়ুর্বেদের এই সকল পৃথক পৃথক অঙ্গের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। প্রত্যেক অঙ্গের অন্ততঃ আট-দশখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ভাষাহীন ইতর প্রাণী ও স্থাবর জীব-বৃক্ষলতাদির উপরে আয়ুর্বেদকারগণের করুণা বর্ষিত হইয়াছিল। সেইজন্য অশ্ব, গো ও হস্তিচিকিৎসাশাস্ত্র ও বৃক্ষচিকিৎসাশাস্ত্র প্রচলিত ছিল। শল্য চিকিৎসার সাফল্য সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়ঃ

"বিশ্‌পলার পা ছিন্ন হইলে কবিরাজগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবার জন্য তাহাকে লোহার পা দিয়াছিলেন।"

ঋগ্‌বেদে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, স্বর্গের বৈদ্য অন্ধকে দৃষ্টি ও খঞ্জকে চলচ্ছক্তিদানে সমর্থ ছিলেন।


বিজ্ঞানের উন্নতি
আগুন
অস্ত্র
বাসস্থান

# বিজ্ঞানের উন্নতি



একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। এই সকল সংস্কারকগণ ও বৈদ্য-গণের অনেকেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। সেইজন্য এই সকল চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যে অনেক আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তথ্য নিহিত আছে।

প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পারদের সর্বরোগনাশিনী শক্তি আবিষ্কার করেন। তাঁহারাই পারদাদি ধাতুসংযোগে তাম্রাদি ধাতুমিশ্রিত আকরিক হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রস্তুত করার কৌশল আবিষ্কার করেন। এই বৈজ্ঞানিকগণের সাফল্য এত উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল যে, একমাত্র পারদ হইতে চতুর্বর্গ ফললাভ হয়, এইরূপ একটি দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীনকালে শারীর বিদ্যার কি অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। রক্তসংবহনতন্ত্র ( circulatory system ) সম্বন্ধে চরক ও সুশ্রুত-সংহিতায় স্পষ্টভাবে বিবৃত আছে যে, হৃদয় হইতে ধমনীগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্ত সর্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া হৃদয়েই ফিরিয়া যায়। গর্ভস্থ শিশুর রক্তপ্রবাহ মাতার হৃদয়ে ফিরিয়া যায় এবং সেখান হইতে পুনরায় গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিকগণ দুই হাজার বৎসর পূর্বে এই তথ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই তথ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন স্যার উইলিয়ম হার্ভে ইংলণ্ডে নূতন করিয়া আবিষ্কার করেন, তখন চিকিৎসকমণ্ডলী এই তথ্যকে হাস্যকর বলিয়া উড়াইয়া দেন। আয়ুর্বেদের বায়ু, পিত্ত ও কফের ত্রিদোষতত্ত্ব বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রেও অনুসৃত হইতেছে।

প্রাচীন ভারত যে রসায়নশাস্ত্রে খুব উন্নতি করিয়াছিল, তাহা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-রচিত 'History of Hindu Chemistry' পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পারদের সহিত গন্ধক সংযুক্ত হইলে তাহার উপকারিতা সহজেই বৃদ্ধি পায়, তাহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়—এই তথ্য প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। ইহাদিগকে পর্পট, মকরধ্বজ প্রভৃতি বলে। ইহার মূল রহস্য পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণের নিকট এখনও অজ্ঞাত।

প্রাচীন হিন্দুগণ রৌপ্য ও রত্নাদির পরীক্ষা এবং মূল্য নিরূপণ করিতে জানিতেন। তাঁহারা খনি হইতে ধাতু নিষ্কাশন ( extraction ) ও ধাতুমিশ্রণ ( alloying ) করিতে জানিতেন। রঞ্জনশিল্পও ( dyeing )

প্রাচীন ভারতে সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহারা বিষ-সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং শৈত্য ও উষ্ণতাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহারা স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, তাম্র, সীসক, দস্তা, রাং ও লৌহ ধাতুর ব্যবহার জানিতেন। তাঁহারা আফিমের ব্যবহারও জানিতেন।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের অস্তিত্বের বিষয়ে আজ কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মুখপত্র 'নেচার' ( Nature ) পত্রিকা এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "যে সকল আবিষ্কার পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে আমরা মনে করিতাম, এখন দেখা যাইতেছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation), অধঃপাতন ( Filtration ), তির্যকপাতন ( Distillation ), ধাতুনিষ্কাশন প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে প্রাচীন হিন্দুদিগের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।…শিক্ষাদানকার্য পরীক্ষার ( Experiment ) সাহায্যে যে কিরূপ ফলদায়ক হয়, তাহা হিন্দুগণ বিস্মৃত হন নাই।"

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ও তাঁহার সেনাপতি সেলুকাস প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া খুব মুগ্ধ হন। তাঁহারা এই বিদ্যার কিছু কিছু নিজ দেশে প্রচার করেন। মহারাজ অশোক বহু দূরদেশে ধর্মপ্রচারক-গণের সাহায্যে আয়ুর্বেদ প্রচার করেন।

দার্শনিক কণাদ পরমাণুবাদ প্রবর্তন করেন। শব্দসঞ্চরণ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত আজও বৈজ্ঞানিকগণের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সাংখ্যদর্শনে উল্লিখিত আছে যে, যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সর্বাঙ্গীণ ধ্বংস সম্ভব নহে। এই তত্ত্বই বর্তমান যুগের 'পদার্থের নিত্যতা' ( Conservation of matter ) তত্ত্ব। নাগার্জুন বৌদ্ধযুগের সুপ্রসিদ্ধ রসায়নাচার্য ছিলেন। তিনি সুশ্রুত-রচিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আমূল সংস্কার করেন। ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র নাগার্জুনের নিকট প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। তাঁহার প্রবর্তিত বহু পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে।

আরবগণ ও গ্রীকগণ তাঁহাদের ভাষায় ভারতের অনেক বৈজ্ঞানিক

পুস্তক অনুবাদ করেন। একজন ভারতীয় চিকিৎসক তুর্কী খলিফার দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিয়া সেখানে রাজ-চিকিৎসক নিযুক্ত হন।

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র খুব উন্নত ছিল। হিন্দু-দিগের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র ধর্মানুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে বৈদিক যুগে দেবতাদিগের পূজার জন্য যে মন্ত্রাদি রচিত হয়, তাহাতে পৃথিবীর আকার ও প্রকার, আকাশস্থ পদার্থের গতিবিধি, কালগণনা প্রভৃতি বিষয় জানা যায়। বৈদিক গ্রন্থে ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

বেলি সাহেব বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে ভারত বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রহগণের গতি পর্যবেক্ষণ করিতেন। এমন কি কেহ কেহ বলেন, বেদের যাগযজ্ঞ জ্যোতিষগণনার ফলাফল-প্রসূত। ইহা চন্দ্র ও সূর্যের পারস্পরিক অবস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত।

হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে রচিত হয়। ইহাতে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের বিষয় উল্লিখিত আছে।

৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব হইতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে কোন জ্যোতিষ-চর্চা হয় নাই। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আবার কতকগুলি জ্যোতিষগ্রন্থ রচিত হয়। এই সময় বিখ্যাত প্রাচীন জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের আবির্ভাব হয়। তিনি স্থির করেন: "পৃথিবী নিজ কক্ষে আপনার মেরুদণ্ডের উপর প্রত্যহ ঘুরিতেছে। ইহা বৎসরে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিতেছে। তারকামণ্ডলী নিশ্চল। পৃথিবীর গতি দ্বারা নক্ষত্রের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সাধিত হয়।" তিনি আবিষ্কার করেন যে, "পৃথিবীর কক্ষ বৃত্তাভাষ (ecliptic) এবং পৃথিবীর আকার গোলাকার।" তাঁহার দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'বৃহৎ সংহিতা' ও 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা'। পৃথিবীর আকার ও গতি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব আর্যভট্টই পৃথিবীতে প্রথম আবিষ্কার করেন।

এই সময়ে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের আবির্ভাব হয়। মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বও যে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের মনে স্থান পাইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। বরাহমিহির বলিয়াছেন যে,

পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রহ্মগুপ্তের মতে প্রাকৃতিক নিয়মে সকল বস্তুই পৃথিবীর অভিমুখে ধাবিত হয়। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের মুকুটমণি ভাস্করাচার্যের আবির্ভাব হয়। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অয়নাংশনির্ণয়, লম্বনির্ণয় (parallax), গ্রহগণনা প্রভৃতি দুরূহ বিষয়গুলির পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গণনাপদ্ধতি পাশ্চাত্ত্য জগতেরও প্রশংসা অর্জন করে।

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্ত' ও 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'। পুরাকালে হিন্দুগণ যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির যথাযথ সময়, গ্রহণযুক্ত চন্দ্র ও সূর্যের পরিবর্তিত আকার-সমূহের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার নিয়মাবলী অবগত ছিলেন, তাহা এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়।

হিন্দুদিগের সময়গণনার দুইটি পদ্ধতি ছিল—একটি চান্দ্র তিথি অবলম্বনে এবং অপরটি রাশিচক্রের সাহায্যে। এইরূপ রাশিবিভাগ দ্বারা কালগণনা হিন্দুগণই প্রথম আবিষ্কার করেন। অনেকের মতে, চীন ও ব্যাবিলন দেশে একসঙ্গে ইহা আবিষ্কৃত হয়। জ্যোতিষের 'ভৃগুসংহিতা' নামক পুস্তকে উচ্চাঙ্গের গণনা আছে। বৈদিক যজ্ঞবেদী নানা আকৃতির হইত। এই সকল যজ্ঞবেদীর রচনা হইতে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ Geometry ও Trigonometry উল্লিখিত কথা দুইটিরই ভাষান্তর বলিয়া মনে হয়।

মহেঞ্জোদারোতে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ভারত বিজ্ঞানে খুব উন্নতি করিয়াছিল। তখনকার পয়ঃ-প্রণালী, অট্টালিকা, নগরপত্তন প্রভৃতি বিষয়ের নিদর্শনগুলি উচ্চ স্থাপত্য-বিজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

পরবর্তী যুগে নির্মিত দিল্লীর মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ এবং উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরসমূহ স্থাপত্যবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করিতে পারেন না যে, কি করিয়া জোড়া না দিয়া এত দীর্ঘ মরিচাহীন লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত করা যায়। ভারতে এইরূপ উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিদর্শন এখনও বর্তমান।

প্রাচীন ভারত বীজগণিতের অনেক সূত্র আবিষ্কার করে। সংখ্যা-লিখন ও পঠন (notation ও numeration) ভারতের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। গণিতে এই দশগুণোত্তর প্রণালী ভারতেরই অপূর্ব অবদান। এই সমস্ত সূত্র ক্রমে আরব দেশে প্রচারিত হয়। হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগণিত ও চিকিৎসাবিজ্ঞান আরবীয় ছাত্রসমাজ গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। বহু হিন্দু পণ্ডিত খলিফাগণের আমন্ত্রণে বাগদাদে বসবাস করেন। আরবীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞান লাভ করিতেন। আরব হইতে এই সকল বিদ্যা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।

ইহার পর কতকগুলি কারণে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অবনতি ঘটে। ভারত অনেকবার বৈদেশিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়। ইহার ফলে অনেক প্রামাণ্য পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়। জন্মগত জাতিভেদপ্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। শল্য-চিকিৎসা ও শবব্যবচ্ছেদ নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইতে থাকে।

উচ্চবর্ণের লোকেরা বিজ্ঞানচর্চার ভার নিম্নবর্ণের উপর ছাড়িয়া দিয়া অন্য দিকে মনোনিবেশ করিলেন। বৌদ্ধযুগের পর হিন্দু-ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় শঙ্করাচার্য মায়াবাদের উপর এত জোর দিলেন যে, ভারতে বিজ্ঞানচর্চার আর সেরূপ প্রসার হইল না।

আধুনিক যুগে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে বিজ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হয় নাই। ইংরেজগণ অফিসের কাজকর্মের জন্য কতকগুলি কেরানী সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত শিক্ষারই প্রবর্তন করেন। তখন বিলাত হইতে শিল্পজাত দ্রব্যও আমদানী হইত। দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানও ছিল না বলিলেই চলে। যে সকল কুটিরশিল্প ছিল, তাহা বিদেশী কলকারখানার প্রতিযোগিতায় দিন দিন লোপ পায়।

সারা ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রবর্তন খুব ধীরে ধীরে হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিও ক্রমে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রবর্তন করে।

বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে বোধ হয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী। বিজ্ঞান-আলোচনার সুবিধার জন্য ও মৌলিক গবেষণার

জন্য তিনি কলিকাতায় Indian Science Association ( ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ্ ) প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বহু বৈজ্ঞানিককে গবেষণার সুযোগ ও প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে গবেষণা করিয়া ডাঃ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন যশস্বী হইয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই পরে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পরিণত হয়। ভারত সরকার পর পর বিভিন্ন প্রদেশে মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর গবেষণা ও প্রেরণার ফলে বোম্বাই-এর জামশেদজী টাটা জামশেদপুরে এশিয়ার বৃহত্তম লৌহ-কারখানা স্থাপন করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষের উদ্যমে এবং রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের বদান্যতায় কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বসু-বিজ্ঞানমন্দির ও বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানমন্দির গবেষণাকেন্দ্র-রূপে স্থাপিত হয়। ইংরেজ আমলে দিনে দিনে দেশে অনেক বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বহু শিল্পজাত দ্রব্য দেশে প্রস্তুত হইতে থাকে।

বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর কর বসাইয়া দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িবার উৎসাহ প্রদান করা হইতে থাকে।

স্বাধীন হইবার পর দেশ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই বিশ বৎসরের মধ্যে দেশে বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় চল্লিশটি গবেষণা-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। হিজলিতে একটি টেক্‌নিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে লাগাইবার জন্য গবেষণা-মন্দির খোলা হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে ভারত সরকার বহু ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান-স্থাপনের কাজ হাতে লইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে সিন্ধ্রি সার-কারখানা, দামোদর বাঁধ-পরিকল্পনা, হীরাকুঁদ বাঁধ-পরিকল্পনা, ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ-পরিকল্পনা ও চিত্তরঞ্জন রেল এঞ্জিন নির্মাণ-কারখানা প্রসিদ্ধ। এই সব পরিকল্পনার কাজ অনেকখানি সাফল্য লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেলায় তিনটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই জাতিই একদিন বিজ্ঞানচর্চায় জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল ভাবিলে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার উদ্রেক হয়। এখন দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে। নূতম উদ্যম লইয়া ভারতীয় যুবকগণ বিজ্ঞান-চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা জগতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে এবং শিল্পে তাঁহাদের গবেষণার ফলপ্রয়োগে দেশের সম্পদ্‌বৃদ্ধি হইতেছে।

# প্রাচীন বৈজ্ঞানিক

## চরক

আয়ুর্বেদীয় যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ **চরকসংহিতা** ও **সুশ্রুতসংহিতা**। মহর্ষি আত্রেয় অগ্নিবেশ প্রভৃতি ছয়জন শিষ্যকে সমানভাবে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষবশতঃ অগ্নিবেশ প্রথমেই উপদেশগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বলিয়া ইহাকে অগ্নিবেশসংহিতা বলে। কালে এই সংহিতার অঙ্গহানি হইলে চরক ঋষি ইহার সংস্কার করেন। ইহাই চরকসংহিতা নামে অভিহিত। ইহাই কায়চিকিৎসাতন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

চরক কে ছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। কেহ বলেন যে, চরক বিখ্যাত কুষাণ নরপতি কণিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। অনেকে বলেন, পতঞ্জলি মুনিই চরক মুনি নামে অভিহিত হইতেন। পতঞ্জলি শরীরের দোষনিবারণের জন্য চরকসংহিতা রচনা করেন। রোগের গতি ও প্রকৃতি-সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। চরকসংহিতা অপেক্ষা সুশ্রুতসংহিতা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। চরকে দার্শনিক মতবাদের কিছু আধিক্য আছে। চরকসংহিতাকে পূর্ববর্তী বহু আয়ুর্বেদ গ্রন্থের সুলিখিত পরিণত সংস্করণ বলা যায়। চরকসংহিতায় দাদ, কাউর, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যঘটিত ঔষধের বিষয় বর্ণিত আছে। ইহাতে নানাপ্রকার বলবর্ধক ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালীর বিবরণ আছে। ইহাতে তুঁতে, হীরাকস, হরিতাল ও গন্ধকসহযোগে বিভিন্ন ঔষধপ্রস্তুতপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম রক্তবর্ণা লোহার পাতকে গোমূত্র-মিশ্রিত হরিতকী, আমলকী ও বহড়ার ক্কাথের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া উৎকৃষ্ট বলবর্ধক ঔষধ প্রস্তুত হইত। ইহাতে দুইপ্রকার ঔষধপ্রস্তুত-পদ্ধতির কথা আছে, যথা—রোগনিবারক ( preventive ) ও রোগনাশক ( curative )।

অনেকের ধারণা, চরকসংহিতা একটি আন্তর্জাতিক চিকিৎসকমণ্ডলীর সম্মেলনের কার্যবিবরণী। ইহাতে লিপিবদ্ধ চিকিৎসাপ্রণালী এইসব চিকিৎসক দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছে।

## সুশ্রুত

সুশ্রুতসংহিতা সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যতন্ত্র (Surgery)। এই গ্রন্থের বিষয় কাশীরাজ দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ ধন্বন্তরি সুশ্রুত ও অন্য শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুশ্রুত ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বলিয়া ইহা সুশ্রুতসংহিতা নামে খ্যাত। সুশ্রুতসংহিতা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চরকে যেমন বিশুদ্ধ চিকিৎসাবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে, সুশ্রুতে তেমন অবিমিশ্র শল্যতন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সুশ্রুত-পাঠে জানা যায় যে, ভারতের প্রাচীন চিকিৎসকগণ অস্ত্রচিকিৎসায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। সুশ্রুতে ১২৭ প্রকার শল্যের উল্লেখ আছে।

সুশ্রুতসংহিতায় ক্ষার (alkali) পদার্থকে অস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে ক্ষারের প্রকৃতি, বিভিন্ন রোগে ক্ষারের ব্যবহার, ক্ষারের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণিত আছে। তীব্র ক্ষারের প্রয়োগে শরীরের রুগ্ণ অংশ হইতে অস্ত্রোপচার ব্যতীত চর্ম ও মাংস অপসারিত করা যায়। কার্যশক্তি অনুসারে ক্ষারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত, যথা—মৃদু, মধ্যম ও তীব্র।

ক্ষার পচনক্রিয়া নিবারণ করে, শরীরের দুরারোগ্য ক্ষত নিরাময় করে, রক্তপাত বন্ধ করে, চামড়া পরিষ্কার করে, অম্ল এবং অজীর্ণ ও ক্রিমি নাশ করে। কুষ্ঠ, দাদ, ফোঁড়া, ক্ষতনালী, আঁচিল, ভগন্দর, গলরোগ প্রভৃতি রোগে ক্ষারের বাহ্য প্রয়োগবিধি দেখা যায়। বর্তমান চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ কদলী প্রভৃতি উদ্ভিদের ভস্মকে গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করা হয়।

তখনকার দিনে কিরূপ শুদ্ধাচারে ঔষধ প্রস্তুত হইত, তাহা ক্ষার-প্রস্তুতপ্রণালী হইতে বোঝা যায়। শরৎকালে শুভ দিন বাছিয়া অনাহারী থাকিয়া শুদ্ধবস্ত্রে কোন বৃক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হইত। ইহাকে অধিবাস বলে। পরের দিন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গাছ

কাটিতে হইত। ইহার পর গাছকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বাতাসশূন্য স্থানে স্তূপ করিয়া স্তূপের উপর চুনাপাথর রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করিতে হইত। ইহাকে হোম-উৎসব বলে। এই গাছের ভস্ম হইতে পরে ক্ষার প্রস্তুত করা হইত।

সুশ্রুতসংহিতায় ঔষধপ্রস্তুতবিধির যে বিবরণ দেওয়া আছে, পরবর্তী যুগে কোন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানেই তদপেক্ষা উন্নততর কোন বিধির উল্লেখ নাই।

## নাগার্জুন

নাগার্জুন সুশ্রুতসংহিতার সংস্কার করেন। এই নাগার্জুন কে, তাহা সঠিক নির্ণীত হয় নাই; তবে তিনি যে বৌদ্ধযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, নাগার্জুন নামক এক মুনি নাগার্জুনতন্ত্র রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা সিদ্ধ নাগার্জুন নামক বৌদ্ধাচার্যের রচিত।

নাগার্জুন নামক রসায়নবিদ্ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। নাগার্জুন তির্যকপাতন ও দহন ( calcination ) প্রক্রিয়ার এবং কজ্জলীর আবিষ্কর্তা। নাগার্জুনতন্ত্রে অনেক জাতুমন্ত্র ও ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে।

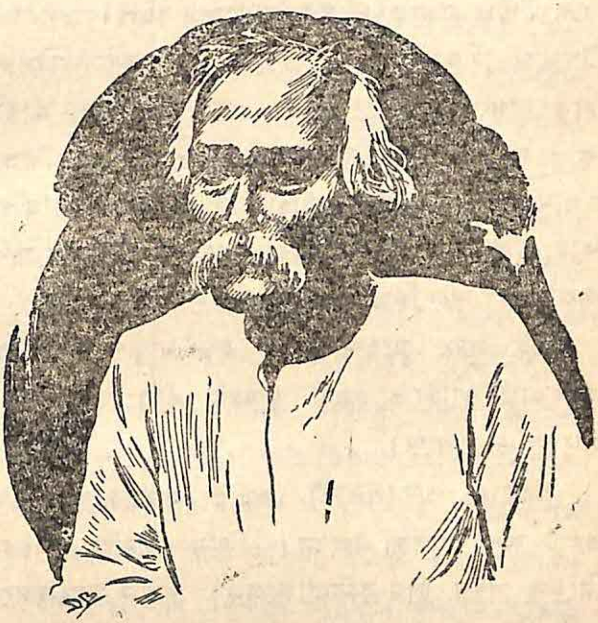
অনেকে মনে করেন, নাগার্জুন ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সাধারণভাবে রাসায়নিক নাগার্জুনকে কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া গণ্য করা হয়। আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে নাগার্জুন ভারতীয় রাসায়নিক-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

# আধুনিক বৈজ্ঞানিক

## ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন কলিকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাশালার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'Indian Association for the Cultivation of Science.' যে মহাপুরুষের একান্তিক চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। এই দেশে বিজ্ঞান চর্চার সর্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক হইলেন ডাক্তার সরকার। 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। বহু বৈজ্ঞানিক এই অ্যাসোসিয়েশনে গবেষণা করিবার সুযোগ পাইয়া জীবনে যশস্বী হইয়াছেন।



কলিকাতার নিকটবর্তী হাবড়া থানায় পাইকপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর মহেন্দ্রলাল এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সাধারণ মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহেন্দ্রলাল অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হন। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার

মাতা তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা লেবুতলাতে তাঁহার মাতুলালয়ে আসেন। তাঁহার মাতুল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার প্রতিপালনের ভার লইলেন। চারি বৎসর পর মহেন্দ্রলালের মাতারও মৃত্যু ঘটে। পিতৃমাতৃহীন বালক তখন হইতে মাতুলদিগের তত্ত্বাবধানে মানুষ হইতে লাগিলেন। দুই মাতুলই তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

তখনকার প্রথানুযায়ী বালক মহেন্দ্রলালকে পাঠশালায় বাংলা শিখাইবার জন্য ভর্তি করা হয়। মহেন্দ্রলাল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পড়াশুনায় খুব মনোযোগ ছিল। সেইজন্য মাতুলরা তাঁহাকে ইংরেজি শিখাইবার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাঁহার নাম ঠাকুরনাথ দে। মহেন্দ্রলাল এই শিক্ষককে আজীবন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁহার এই শিক্ষক সম্পর্কে লেখেন, "আমার পুরাতন শিক্ষক, যাঁহার নিকট হইতে আমি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করি, তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।" তখনকার দিনে এইরূপ গুরুভক্তি বিরল ছিল না।

এই সময় মহেন্দ্রলালের বড় মাতুলকে সরকারী কার্যোপলক্ষে কলিকাতা ছাড়িতে হয়। সুতরাং একা ছোট মাতুলের উপর মহেন্দ্রলালের ভার পড়ে।

নিঃস্বার্থ পরোপকারী হেয়ার সাহেব সেই সময়ে কলিকাতায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এদেশীয় লোকদিগের শিক্ষার জন্য নিজের সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ছোট মাতুল মহেশের চেষ্টায় বালক মহেন্দ্রলাল হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্তি হন। ইহার দেড় বৎসর পর হেয়ার সাহেব ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে হেয়ার সাহেবের শিক্ষা তাঁহার চরিত্রে গভীর রেখাপাত করে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় হইতে মহেন্দ্রলাল জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হিন্দু কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) ভর্তি হন।

মহেন্দ্রলালের জ্ঞানের পিপাসা ছিল অসাধারণ। তিনি শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়িয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি পাঠ্যবহির্ভূত বহু পুস্তক পড়িয়া

জ্ঞানার্জন করিতে লাগিলেন। সেইজন্য তিনি কলেজের অধ্যাপকদিগের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। বিজ্ঞানপাঠে মহেন্দ্রলালের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিতে লাগিল; কিন্তু সে সময়ে হিন্দু কলেজ বা অন্য কোন কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেবল মেডিক্যাল কলেজে সামান্য বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হইত। বিজ্ঞানপাঠের আকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্য তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে মহেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকশিত হইতে লাগিল। মনে হইল, এতদিনের পরে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি পরম উৎসাহ সহকারে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে মেডিক্যাল কলেজে যতগুলি পুরস্কার, পদক ও বৃত্তি ছিল, তিনি নিজ প্রতিভাবলে সমস্তগুলিই লাভ করেন। ছাত্রজীবনে মহেন্দ্রলালের অধ্যয়নই ছিল তপস্যা। মহেন্দ্রলালের বিদ্যার্জনে কিরূপ আগ্রহ ছিল, একটি ছোট ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যায়। মহেন্দ্রলাল যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন একদিন তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের চোখ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে কলেজের হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে ডাক্তার আর্চার পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে চক্ষুরোগ সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কিন্তু একটি ছাত্রও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। মহেন্দ্রলাল দূর হইতে প্রশ্ন শুনিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া সঠিক উত্তর দিলেন। ডাঃ আর্চার মহেন্দ্রলালকে ডাকিয়া নিকটে আনিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে, মহেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আর্চার সাহেব মহেন্দ্রলালের উপর এত প্রীত হইলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার পরীক্ষাগারে চক্ষুরোগের বিষয় ভালরূপে অধ্যয়ন করিবার বিশেষ অনুমতি দিলেন। কিছুদিন পরে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদিগের সম্মতি লইয়া মহেন্দ্রলাল চক্ষু সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

এইরূপ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত ছয় বৎসর অধ্যয়নের পর ১৮৬০

খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল্. এম্. এস্. ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার তিন বৎসর পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম্. ডি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি দ্বিতীয় এম্. ডি. হইবার গৌরব অর্জন করেন।

এই বৎসরই প্রসিদ্ধ ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলিকাতায় ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি শাখা স্থাপিত হয়। বড় বড় অ্যালোপ্যাথ, ইংরেজ ও বাঙালী চিকিৎসক এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হন। মহেন্দ্রলাল ইহার প্রথম সভায় সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তখন অ্যাল্যোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদিগের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। মহেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে অ্যালোপ্যাথি প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেন। তিনি এই সভায় তীব্র ভাষায় হোমিওপ্যাথি প্রণালীর সমালোচনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে, অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদিগের উদাসীনতায় হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারগণ সমাজের ক্ষতিসাধন করিতেছে। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বাগ্মিতায় সকলেই মুগ্ধ হন। মহেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন এবং তিন বৎসর পরে সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। এই সময় তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তিনি খুব পসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি সত্যের প্রতি অনুরাগী হন। মহেন্দ্রলালের যে সত্যের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তাহার বিষয় এখন বলা হইবে। এই সময় একটি ঘটনা তাঁহার জীবনে ও তাঁহার অনুসৃত চিকিৎসাপদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। একদিন এক বন্ধু তাঁহাকে 'ফিলজফি অফ্ হোমিওপ্যাথি' নামক একখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য পাঠ করিতে দিলেন। তিনি এই পুস্তক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া এক নূতন জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইলেন। এই পুস্তকপাঠে মহেন্দ্রলালের হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন হইল। মহেন্দ্রলাল কিরূপ সদাশয়, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক ছিলেন, তদানীন্তন ঘটনাবলী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানলাভ করিবার জন্য

বিদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ পুস্তক আনাইয়া গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া হোমিওপ্যাথি-তত্ত্ব জানিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসার প্রত্যক্ষ ফলাফল দেখিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়কার বিখ্যাত ধনী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তের সহিত হোমিওপ্যাথি-তত্ত্বের বিচার আরম্ভ করেন এবং তাঁহার সহিত এই প্রণালী অনুসারে কতকগুলি কঠিন রোগীর চিকিৎসা দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা-প্রণালীর প্রত্যক্ষ সুফল দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, ইহাতেও সত্য নিহিত আছে। তিনি ক্রমশঃ হোমিওপ্যাথির প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন।

এইরূপ মতপরিবর্তনের জন্য অনেক অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলালের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চক্রান্তে ক্রমশঃ মহেন্দ্রলালের রোগীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। ছয় মাস তিনি একটি পয়সাও উপার্জন করিতে পারিলেন না, কিন্তু সত্যের প্রতি অনুরাগ ও ভগবানে অগাধ বিশ্বাসের জন্য তিনি নিজের সংকল্প হইতে একটুও বিচ্যুত হইলেন না।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই ঘটনাবলীর একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্থোপার্জন ও সুখস্বাচ্ছ্যন্দের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্দ্রলাল সে ধাতুর লোক ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত, তাহা তিনি হৃদয়-মনের সহিত অবলম্বন করিতেন। তিনি তাহা প্রচার বা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, অথবা সত্যাবলম্বন বিষয়ে ক্ষতিলাভ বা লোকের অনুরাগ-বিরাগের ভয় করিতেন না। তিনি তাঁহার মতপরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করিলেন।

"১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশন হইল। সেইদিন ডাক্তার সরকার এক বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি অ্যালোপ্যাথি-চিকিৎসা-প্রণালীর কতকগুলি দোষ কীর্তন করেন এবং হোমিওপ্যাথির যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করেন

"তাঁহার বক্তৃতায় ইংরেজ ডাক্তারগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ওয়ালার নামক একজন ডাক্তার বলিলেন, 'ডাক্তার সরকার আর যদি একটা কথা বল, তবে তোমাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দিব।' তিনি আরও বলিলেন, ডাক্তার সরকার যদি উক্ত সভার সহকারী সভাপতি হওয়া দূরে থাকুক, সভ্যও থাকেন, তবে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন না। অন্যান্য খ্যাতনামা ডাক্তারগণও তাঁহার মতে সায় দেন। সভামধ্যে সভ্যগণের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইল।

"ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া গম্ভীরভাবে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, 'আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব তাতে আর কি? সত্য যা বলতেই হবে ও করতেই হবে।"

ওদিকে সংবাদপত্রের স্তম্ভসকল এই বার্তাতে পূর্ণ হইতে লাগিল। ডাক্তারেরা তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলেন। সকলে তাঁহাকে বর্জন করিলেন। শহর তোলপাড় হইতে লাগিল। তাঁহার পসার কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটি রোগীও পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা ঘোষণা করিতে বিরত হইলেন না।

মহেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে একটি প্রবল শক্তিশালী দল গঠিত হইল কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিলেন না। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ্ মেডিসিন' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া মহেন্দ্রলাল পূর্ণোদ্যমে হোমিওপ্যাথি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ঘোরতর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে সত্য চরমে জয়যুক্ত হইবে, এই বিশ্বাসেই তিনি অটল ছিলেন। তাঁহার সমব্যবসায়ী বন্ধু ও শিক্ষকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেও এবং তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করিলেও তিনি সর্বদাই উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও আমার মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক, আমি বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। সকলের

বাহুই আমায় বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইয়াছে, কিন্তু আমার বাহু কাহারও বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে না। বোধ হয় আমার রুটি মারা যাইবে, কিন্তু আমি যীশুখ্রীষ্টের বাণী ভুলিব না : 'মানুষের শুধু রুটি দিয়া বাঁচা উচিত নয়, কিন্তু ভগবানের মুখনিঃসৃত প্রত্যেক বাণীর দ্বারা বাঁচা উচিত'।"

এই কথা কয়টিতে মহেন্দ্রলালের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও ভগবানে বিশ্বাস পুনরায় তাঁহাকে যশের পথে প্রতিষ্ঠিত করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার হোমিওপ্যাথিতে প্রচুর পসার হইল। তিনি অ্যালোপ্যাথির চেয়ে চতুর্গুণ উপার্জন করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও কখনও দুই শত টাকা ভিজিট লইতেন। প্রতিভা কখনও ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না।

মহেন্দ্রলাল ছাত্রাবস্থায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন।

মহেন্দ্রলাল বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বিজ্ঞানচর্চা তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন বিজ্ঞান-অনুশীলন ব্যতীত এই দেশের কোনরূপ উন্নতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি নিজের জীবন দান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার স্বদেশবাসীর শুধু উন্নতির জন্য নয়, সমগ্র জাতির অভ্যুদয়ের (regeneration) জন্য বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যকতা আছে। এই সম্বন্ধে আমার ধারণা বদ্ধমূল, নচেৎ এই বিষয়ে তাহাদিগকে সজাগ করার জন্য আমি জীবন বিসর্জন করিতাম না।"

প্রথমে তিনি নিজের বাড়িতে একটি বিজ্ঞান ক্লাস খুলিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। এইরূপে তাঁহার মনে একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সংকল্প জাগিয়া উঠে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সংকল্পের কথা তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং দেশে বিজ্ঞানচর্চার জন্য আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ক্লাসে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তিত হইল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক লেফন্ট সাহেব মহেন্দ্রলালের সহায়ক হইলেন। প্রায় ছয় বৎসর চেষ্টার পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই

জানুয়ারি কলিকাতায় 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় লোক দ্বারা পরিচালিত হইত। তিনি নিজে সুললিত ভাষায় নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আমাদের দেশের ছাত্ররা সুযোগ-সুবিধা পাইলে অন্য যে-কোন দেশের ছাত্রদের মত বিজ্ঞানে পারদর্শী হইতে পারিবে।

কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ছাত্ররা যাহাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার সুযোগ পায়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বহু ছাত্রকে বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠানের খরচে বিদেশে পাঠান হয়। মহেন্দ্রলালের আজীবনসঞ্চিত প্রচুর অর্থে ইহা স্থাপিত হইলেও বহু দানশীল ব্যক্তির বদান্যতায় ইহা পরিচালিত হয়। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন ও অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করিবার সুযোগ পাইয়া যশস্বী হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন না থাকিলে রমনের জীবন অন্য পথে চালিত হইত। এই প্রচেষ্টায়ও একদল লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামক একটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ( useful science ) শিক্ষা দিয়া দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। মহেন্দ্রলাল বলিলেন, "আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা মোটেই আরম্ভ হয় নাই। এ অবস্থায় আমাদের প্রধান কর্তব্য দেশে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গঠনে সাহায্য করা। তখন আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে এবং শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ চলিতেছে।" যাহা হউক, কয়েক বৎসর পর 'ইণ্ডিয়ান লীগ' উঠিয়া গেল।

মহেন্দ্রলাল নিজে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেন নাই, কোন মৌলিক গবেষণাও করেন নাই। কিন্তু তিনি এদেশে বিজ্ঞানচর্চার আদি-গুরু বলিয়া চিরকাল সকলের পূজ্য। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন তাঁহার জীবনের সাধনার ফল।

মহেন্দ্রলাল তৎকালীন সকল বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য এবং আর্ট ফ্যাকাল্‌টির

সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকার তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধি প্রদান করেন। তিনি পর পর চারি বৎসর ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। পরে তিনি স্বেচ্ছায় এই পদ ত্যাগ করেন। তিনি বহু বৎসর এশিয়াটিকে সোসাইটির সভ্য ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারী ডি. এল্. উপাধি প্রদান করেন। ইহা ছাড়া তিনি বিদেশে অনেক বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে শেষজীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায়। তদুপরি ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহাকে খুব দুর্বল করিয়া দেয়। তিনি হাঁপানিতে আক্রান্ত হন। তিনি ম্যালেরিয়াকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। তিনি সহজে ম্যালেরিয়া রোগী দেখিতে যাইতেন না। কিন্তু দুঃস্থের চোখের জলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তিনি একবার হুগলীতে একটি গরীব ছেলের ম্যালেরিয়া চিকিৎসা করিতে যান। কলিকাতার বাহিরে তখন তাঁহার ভিজিট ছিল দৈনিক একশত টাকা। তিনি ১৮ দিন চিকিৎসা করিয়া এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেন। আর একবার বালিগঞ্জে এক রাজাকে চিকিৎসা করিতে যাইয়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। তখন বালিগঞ্জে ভীষণ ম্যালেরিয়া হইত। তিনি এই আক্রমণ হইতে জীবনে আর আরোগ্য লাভ করেন নাই। ইহার পর হইতে তিনি একদিনও সুস্থ জীবনযাপন করেন নাই।

এই রোগাক্রান্ত শরীর লইয়া তিনি একদিনের জন্যও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা দিতে বিরত হন নাই। এতই প্রাণ দিয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসিতেন! একদিন রোগী দেখিবার দুই শত টাকা ভিজিটের লোভ সংবরণ করিয়াও তিনি ঠিক সময়মত উক্ত প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেন।

নিজে রোগী হইয়া অপরের রোগযন্ত্রণা তিনি ভালভাবে বুঝিতেন। বৈদ্যনাথে কুষ্ঠরোগীদের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি পাঁচহাজার টাকা দান করিয়া একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি শেষ বয়সেও পাঠাভ্যাস ত্যাগ করেন নাই। দেশ-বিদেশ হইতে প্রতিমাসে প্রচুর পুস্তক আসিত। তাঁহার গ্রন্থাগার একটি অমূল্য সম্পদ্ ছিল।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকালে মহেন্দ্রলাল পরলোক গমন করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই মহাপুরুষের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য ঃ

"বঙ্গদেশকে যত লোক লোকচক্ষে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত বাঙালীগণের মধ্যে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরূপ বিমল সত্যানুরাগ অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি অল্প বাঙালীই দেখাইতে পারিয়াছে। এইরূপ জ্ঞানানুরাগ এই বঙ্গদেশে দুর্লভ।"

# আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আজকাল ঘরে ঘরে বেতারযন্ত্র বা রেডিও। এই যন্ত্রে হাজার হাজার মাইল দূর দেশ হইতে কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের আদিকথা কয়টা লোকই বা জানে?

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। কলিকাতা টাউন হলে বিরাট সভা। বাংলার ছোটলাট স্বয়ং সভাপতি। বক্তা সৌম্যদর্শন তরুণ বাঙালী অধ্যাপক। সম্মুখে তাঁহার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। তিনি এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে এক নূতন বিস্ময়কর রহস্যের কথা জ্ঞাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ শ্রোতারা ৭৫ ফুট দূরে জনশূন্য একটি তৃতীয় কক্ষে আপনা-আপনি একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিতে ও বিস্ফোরণের আওয়াজ হইতে শুনিল; এই ভৌতিক ব্যাপারে সকলেই অবাক্ হইলেন। বক্তার উদ্ভাবিত যন্ত্র হইতে নির্গত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দুর্ভেদ্য দেওয়াল ভেদ করিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বক্তা তাঁহার কর্মস্থল হইতে আধ মাইল দূরে তাঁহার গৃহে সাঙ্কেতিক শব্দপ্রেরণে সমর্থ হন। এইরূপ বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বিদ্যুৎ-তরঙ্গের অস্তিত্ব একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক প্রথম আবিষ্কার করেন। ইনিই হইলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আবিষ্কারের জয়মাল্য তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না! সে কথা পরে বলিব।



ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় রাড়িখাল নামে একটি গ্রাম আছে। জগদীশচন্দ্র এই গ্রামে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু তখন ফরিদপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের শৈশব সেইখানেই অতিবাহিত হয়।

বাংলা স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। তখন ভগবান বসু বর্ধমানে থাকিতেন। সুতরাং জগদীশচন্দ্রকে হোস্টেলে থাকিতে হইল। শহরের সভ্যতাভিমানী ছেলেরা পাড়াগেঁয়ে বালক জগদীশচন্দ্রকে নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত। তিনি পরিহাস সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সুযোগ পাইলেই তাহাদের উপর কিল-চড়-ঘুষি বর্ষণ করিতেন।

হেয়ার স্কুলে তিনমাস পড়িবার পর জগদীশচন্দ্রকে সেণ্ট জেভিয়াস স্কুলে ভর্তি করা হয়। হোস্টেলের উঠানের একধারে একটি ছোট বাগান করিয়া তিনি উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা বর্ধমানে একটি শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে কারিগরদিগকে যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিতে দেখিয়া খুব আনন্দবোধ করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার নূতন তথ্য আবিষ্কারের ইচ্ছা জন্মে।

ষোল বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি তৎপরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির একটি জাদুঘর আছে। এই যন্ত্রপাতি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। এই সময় অধ্যাপক ফাদার লেফণ্টের শিক্ষা-পদ্ধতির জন্য তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ (বিজ্ঞান শাখা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

জগদীশচন্দ্র উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিলাত যাইবার সংকল্প করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হন, কিন্তু পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি তথায় বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বিলাতে পৌঁছিয়া প্রথমে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু লণ্ডনে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান-বিভাগে ভর্তি হন। চারি বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থবিদ্যায় 'ট্রাইপস' (Tripos) এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। এখানকার বিখ্যাত অধ্যাপকগণের সংস্পর্শে আসিয়া

তাঁহার মনে গবেষণা করিবার স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি এই সকল অধ্যাপকের নিকট হইতে কঠোর শ্রমের ও ধৈর্যের মূল্য শিক্ষা করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু এই পদে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকগণ যে বেতন পাইতেন, তাহার অর্ধেক তাঁহাকে দেওয়া হইল। অধিকন্তু এই পদ অস্থায়ী বলিয়া উক্ত বেতনেরও অর্ধেক কাটিয়া দেওয়া হইল। এই ব্যবহারে স্বাধীনচেতা জগদীশচন্দ্রের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। তিনি এইরূপ অল্পবেতন গ্রহণ না করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু চাকুরি ত্যাগ করিলেন না। তিনি এইরূপে বিনা বেতনে তিন বৎসর কাজ চালাইয়া গেলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিজ্ঞানে তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তখন সরকার শুধু তাঁহাকে পূর্ণ বেতনে চাকরিতে স্থায়ীই করিলেন না, পরন্তু তাঁহাকে তিন বৎসরের সম্পূর্ণ বেতন একসঙ্গে দেওয়া হইল। এই দুঃসময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উৎসাহিত করেন।

জগদীশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন, তখন কলেজে উপযুক্ত গবেষণাগার ছিল না। তিনি দশ বৎসর চেষ্টা করিবার পর একটি ছোট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তিনি গবেষণা করিয়া বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি বিলাতের বৈজ্ঞানিক মহলে প্রশংসালাভ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁহার গবেষণা চালাইবার জন্য তাঁহাকে অর্থসাহায্য দেন।

ইহার পর জগদীশচন্দ্র বিনা তারে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বার্তাপ্রেরণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনিই জগতে প্রথম এইরূপ বার্তাপ্রেরণে সক্ষম হন। জগদীশচন্দ্র ইচ্ছা করিলে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা কোটি কোটি টাকা উপায় করিতে পারিতেন, কিন্তু নির্লোভ জগদীশচন্দ্র প্রকৃত সাধকের মত নূতন জ্ঞানলাভে ব্যাপৃত থাকিলেন। এই সময়ে বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি ছড়াইয়া

পড়ে। তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ রয়াল সোসাইটি কর্তৃক বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন। ইহা যে-কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উচ্চ সম্মান।

জগদীশচন্দ্র পূর্বেই বিদ্যুৎ-বিষয়ের গবেষণা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। তিনি জগতে একটি নূতন জ্ঞানের সন্ধান দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী একইভাবে উত্তেজনায় সাড়া দেয়। চিমটি কাটিলে, আঘাত করিলে, তপ্ত লোহার ছেঁকা দিলে, অ্যাসিডে পোড়াইলে উদ্ভিদ মানুষের মতই উত্তেজিত হয়। এমন কি, জড় পদার্থও বিভিন্ন উত্তেজনায় সাড়া দেয় এবং ইহারাও উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মতই ক্লান্ত হয়। তিনি দেশীয় কারিগর দ্বারা এমন সব সূক্ষ্মতম যন্ত্র নির্মাণ করাইলেন যে, উদ্ভিদের মুহূর্তের বৃদ্ধি এবং উদ্ভিদের উপর বিভিন্ন উত্তেজক দ্রব্যের, বিভিন্ন খাদ্যের ও বিভিন্ন বিষ-ক্রিয়ার ফল বহুগুণ বর্ধিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইল। তাঁহার আবিষ্কৃত শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হইল **ক্রেস্কোগ্রাফ**। গাছের উপর আলো ফেলিলে, গাছকে অন্ধকারে রাখিলে, গাছে চিমটি কাটিলে, গাছে বিষ প্রয়োগ করিলে যে অতি সামান্য পরিবর্তন হয়, তাহা দশ লক্ষ হইতে কোটি গুণ বৃদ্ধি পাইয়া এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ সময় অনায়াসে নির্ণীত হয়।

এই আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় জগদীশচন্দ্রের কথায় বলি, "আমি এখন ভাবে আবিষ্ট হইয়া আছি।…জন্তু ও অজীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান আছে, তাই সেতু বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদের জীবনে স্পন্দনরেখা আছে কি-না, তার চেষ্টা করিতেছিলাম। প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও অজীব! এক! এক! সব এক! কেবল এই মাত্র উদ্ভিদ্, পরমুহূর্তে জীব, পরমুহূর্তে অজীবকে রাখিয়া দেখাইব একই হস্তলিপি। ইহার অন্ত কোথায়? কত বিজ্ঞান এককীভূত হইবে! বিষ খাইল, মরিল, সব চুকিয়া গেল, কিন্তু কেন মরিল, কি মানবিক কলে চাবি পড়িল? জীবনের ধারা উদ্ভিদে ও প্রাণীতে এক।"

জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক জগতে বিষম সাড়া পড়িয়া গেল। একদল বৈজ্ঞানিক চক্রান্ত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ

করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিদেশে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে একাকী তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার কথা প্রচার করিতে হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার প্রবন্ধ চুরি করিয়া অন্যের নামে প্রকাশ করা হয়। সেই চুরি পরে ধরা পড়ে। শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের জয় হয়।

জগদীশচন্দ্র বহুবার ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশে এবং মিশর ও জাপানে বক্তৃতা দিতে আহূত হন। তিনি বিদেশ হইতে বহু সম্মান ও উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটির সদস্য ( F. R. S. ) নির্বাচিত হন। ভারতে তিনি দ্বিতীয় এফ. আর. এস.। তৎকালীন ভারত-সরকার তাঁহাকে 'স্যার' উপাধি দেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ বৎসর অধ্যাপনার পর তিনি সরকারী চাকরি হইতে পূর্ণ বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্মানের জন্য তাঁহাকে আমরণ অধ্যাপক বলিয়া গণ্য করা হয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর কলিকাতায় 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' স্থাপিত হয়। এইবার তাঁহার জীবনের বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সার্থক হইল। এইখানে বর্তমানে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে নির্মিত। দেওয়ালগুলিও ভারতীয় আদর্শে চিত্রিত। এই বসু-বিজ্ঞান-মন্দির সমস্ত জগতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের সুযোগ্যা পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু স্বামীর কার্যে উৎসাহদান করেন।

দেশবাসী তাঁহার সপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসবে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করেন।

জগদীশচন্দ্র শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি বহু ভাষায় প্রবন্ধ লেখেন এবং গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতিও ছিল অসাধারণ। তিনি মনপ্রাণ দিয়া ভারতকে ভালবাসিতেন। মাতৃভূমির মলিন ছবি তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত

করিত। তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি আমাকে শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তবে আমি পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।”

জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর গিরিডিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। জগদীশচন্দ্র 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে' তের লক্ষ টাকা দান করেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার আবিষ্কৃত পথে তাঁহার কোন ছাত্রই আর গবেষণা করেন নাই।

# আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

স্থান বিজ্ঞান কলেজের দোতলার একটি কক্ষ। একটি ক্যাম্বিসের খাটিয়ায় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুইয়া পুস্তক পড়িতেছেন। তাঁহার গায়ে একটি ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে ছোট মোটা ধুতি, দেহ শীর্ণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে দু'একটি সাধারণ চেয়ার, পুস্তকপূর্ণ কতকগুলি আলমারি। দরজায় কোন দরওয়ান বা বেহারা নাই। একজন সাহেব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "I want to see Dr. Roy." বৃদ্ধ ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, "I am Dr. Roy." সাহেব কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যাঁহার বৈজ্ঞানিক বলিয়া জগৎজোড়া নাম, তিনি অতি সামান্য লোকের ন্যায় জীবনযাপন করেন! ইনিই হইলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।



খুলনা জেলার রাড়ুলি-কাটিপাড়া নামক গ্রামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র উদারমতাবলম্বী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য নিজগ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রফুল্লচন্দ্র কিছুদিন গ্রাম্য স্কুলে পড়িবার পর পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি কঠিন আমাশয় রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া স্কুল ছাড়িয়া বাড়িতেই পড়াশুনা করিতেন। তিনি তাঁহার পিতার লাইব্রেরির অনেক বই পড়িয়া ফেলেন। এই সময়ে তাঁহার যে অধ্যয়নস্পৃহা জাগ্রত হয়, তাহা শেষ জীবন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চলে গেছে বুঝতে পারিনি। আজ বার্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই

আছি। আমি দিনের মধ্যে দু'ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি। দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত, ধ্যান-ধারণার সমতুল্য। প্রতিদিনকার কর্তব্যবোধে সময়ের সদ্‌ব্যবহার করা চাই।"

দুই বৎসর পরে আরোগ্যলাভ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র আলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে ব্রাহ্ম শিক্ষকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন। তিনি এই স্কুলে প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে আসেন। কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন চমৎকার ইংরেজী পড়াইতেন।

প্রফুল্লচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রোপলিটন কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময় বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় জীবনে নবচেতনার সূচনা করেন। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইতেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি 'গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ' নামক বৃত্তি লাভ করিয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তখন তিনি বি. এ. পাস করেন নাই।

বাল্যকাল হইতে তাঁহার ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ থাকিলেও তিনি এডিনবরায় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইহার দুই বৎসর পর রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করিয়া ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন। তাঁহার এই গবেষণার জন্য তিনি 'হোপ প্রাইজ' নামক পুরস্কার পান।

প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া অনেক চেষ্টার পর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করিতে থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত ল্যাবরেটরির অভাবে গবেষণার কাজে বাধাসৃষ্টি হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন অবিবাহিত ছিলেন, কিন্তু তিনি ছাত্রদিগকে স্নেহ করিতেন এবং ছাত্রগণও তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিত। তিনি পুত্রাধিক ছাত্রদিগের দরদী বন্ধু ছিলেন। তিনি কত গরীব ছাত্রকে অর্থ ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তিনি ছাত্রদিগকে বলিতেন,

"বাঙালী ছাত্রদিগের প্রধান শত্রু পড়বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ করলে গল্প আসবেই—অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আসবেই; আর বাঙালীর প্রধান বিপদ আড্ডা।"

"তোমরা অনেকে পরীক্ষায় ফার্স্ট, সেকেণ্ড হও—সেটা ভাল, কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ, কারণ পাসের পর তোমরা হও নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া-জীর্ণ, রুগ্ণ, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি; কিন্তু এই পাস না করতে পারলেই তোমাদের মুখ হয় আঁধার। এ অবস্থায় থাকলে চলবে না। এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ।"

"যে শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয় এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে এবং মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র মারকিউরাস্ নাইট্রাইট নামক একটি পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এই আবিষ্কারে তিনি বিজ্ঞান-জগতে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি পরে আরও অনেক নাইট্রাইট-জাতীয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। সেইজন্য তাঁহাকে 'Master of nitrites' বলা হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-রূপে লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয় মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়ে তাঁহাকে ডি. এস-সি. উপাধি প্রদান করে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন এবং অবসরগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের বদান্যতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষের অনুরোধে প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি পর বৎসর সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে অক্লান্তভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণাকার্য চালাইয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্তি 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা। ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে বার্থেলো তাঁহাকে এই বিরাট কার্যে উৎসাহিত করেন। মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, বারাণসী, তিব্বত প্রভৃতি বহু স্থান হইতে প্রাচীন পুঁথিসকল সংগৃহীত হইল। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ অসীম অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুগণ রসায়নশাস্ত্রে খুব উন্নতি করিয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের তৃতীয় অক্ষয়কীর্তি একদল নব্য রাসায়নিক-সৃষ্টি। তাঁহারই উৎসাহে এই সকল ছাত্র মৌলিক গবেষণা করিয়া জগতে খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রফুল্লচন্দ্রের চতুর্থ কীর্তি বেঙ্গল কেমিকেল নামক রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার মাসিক ২৫০, টাকার বেতন হইতে কিছু কিছু পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করেন এবং সামান্য উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করেন। এইরূপে ৮০০ টাকার পুঁজি সম্বল করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র আপার সার্কুলার রোডের ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এখন বছরে এই কোম্পানির দেড় কোটি টাকার বেশী মাল বিক্রয় হয়। দুইটি বিরাট কারখানায় মাল প্রস্তুত হয়। প্রথম অবস্থায় তিনি নিজে এই প্রতিষ্ঠানের

জন্য কুলির মত খাটিতেন। তিনি অতি দুঃখে শ্রমবিমুখ ও চাকরিপ্রিয় বাঙালীর জন্য বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের লোক শ্রমের মর্যাদা বুঝেন না। পরিশ্রম করলেই ছোট লোক হ'ল—এই ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে। যে বলে আমি কুলিগিরি করব, আমি তাকে ধন্যবাদ দিই। 'বসে খাব' বা 'কারও স্কন্ধে চেপে খাব' এ বড় জঘন্য কথা। যে অলস, যে পরজীবী, তার বেঁচে থাকবার অর্থ নেই।"

"অন্ন-সমস্যার মীমাংসা করতে পারলে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া আমার অন্য কিছু বলবার নাই।"

বাঙালী জাতির দৈন্য-দারিদ্র্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্তরকে খুব ব্যথিত করিত। যাহাতে বাঙালী যুবকগণ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য তিনি অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেন। তিনি বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সমাজের সেবা করা প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে অন্যতম মহদুদ্দেশ্য ছিল। ক্ষীণ দেহ লইয়া তিনি নানা জনহিতকর কার্যে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের খুলনা দুর্ভিক্ষে এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গের বন্যায় সংকটত্রাণ সমিতি গঠন করেন। তিনি চাঁদা তুলিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের দ্বারা দুঃস্থ লোকদিগের মধ্যে ঔষধ, খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করিলেন। তিনি প্রথমে গান্ধী-প্রবর্তিত চরকা ও খদ্দরের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পরে বুঝিলেন, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীরা অবসরসময়ে চরকায় সূতা কাটিলে ও কাপড় বুনিলে জীবিকানির্বাহের অনেক সাহায্য হইবে।

হিন্দুসমাজ-সংস্কারের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র খুব চেষ্টা করেন। নারীজাতির উন্নতির জন্য, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের জন্য তিনি বহু বক্তৃতায় উপদেশ দিয়াছেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনে সভাপতিরূপে তিনি বলেন, "তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু একথা যেন না ভোলেন যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের দেশভ্রাতাগণকে চণ্ডাল, অন্ত্যজ, পঞ্চমা প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধানে অভিহিত করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখেন, তবে তাঁহারা সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতির আশা সম্পূর্ণ নাশ করিবেন। এই ছুৎমার্গের হাত এড়াইতে না পারিলে হিন্দুধর্ম পৃথিবী হইতে লোপ

পাইবে। নোংরা দেশাচার ও পাপাচার আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না।”

প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হইলেও তিনি সাহিত্যচর্চা করিতে খুব ভালবাসিতেন। সেক্সপীয়ার, মিলটন, ডিকেন্স প্রভৃতি গ্রন্থকারের বই তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল। 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির বড় নিদর্শন। তাঁহার বাংলায় লেখা অধিকাংশ বই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়-সম্বন্ধীয়। 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারা', 'বাংলার অন্নসমস্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও পুস্তক তাঁহার বাংলা সাহিত্য-রচনার নিদর্শন। তিনি রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষাবিস্তারের জন্য খুব চেষ্টা করেন। তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা এবং পরে তাঁহার পাঁচ বৎসরের বেতন ষাট হাজার টাকা দান করেন। তিনি কয়েক বৎসর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি খদ্দর-প্রচারের জন্য প্রায় ৫৬০০০ টাকা দান করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র চিরকুমার ছিলেন। তিনি অতি সরল জীবন যাপন করিতেন। পোশাক-পরিচ্ছদও অতি সাধারণ ছিল। তাঁহার নিকট ছিল সকলের অবারিত দ্বার। তিনি সকলের সঙ্গে মধুর ও অমায়িক ব্যবহার করিতেন। তিনি ছাত্রদিগের আদর্শ গুরু ছিলেন। ছাত্রদিগের চরিত্র-গঠনে ও জ্ঞানবৃদ্ধির প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি জাতীয় কল্যাণের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। তিনি বিজ্ঞান কলেজের একটি ঘরে ছাত্রপরিবৃত হইয়া বাস করিতেন।

আচার্যদেব ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন দেহত্যাগ করেন।

## স্যার সি. ভি. রমন

সমুদ্রের বক্ষ ভেদ করিয়া জাহাজ চলিয়াছে। চারিদিকে নীল জলরাশি, উপরে নীল আকাশ। একজন আরোহী জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রকৃতির শোভা দেখিতেছেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, আকাশ, সমুদ্রের জলরাশি ও তাহার ফেনার নীলবর্ণ পরিবর্তিত হইতেছে। তিনি কেবিনে যাইয়া ইহার কারণ সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া একটি তথ্য আবিষ্কার করেন। ইনিই হইলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন।



রমন ত্রিচিনাপল্লীতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র মাতাপিতার গুণ প্রাপ্ত হয়—এই কথা রমনের জীবনে খুব প্রযোজ্য। রমনের পিতা পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সঙ্গীতযন্ত্র বাজাইতে ভালবাসিতেন। তিনি আজীবন শিক্ষক ছিলেন। রমনের মাতাও খুব ধর্মশীলা ও অধ্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। পুত্র রমনের মধ্যেও এইসব গুণ বর্তমান ছিল। ইহা আমরা পর পর দেখিব।

রমনের প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ালটেয়ারে হয়। এখানে রমনের পিতা অধ্যাপক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন

এবং লেখাপড়ায় কৃতিত্ব দেখাইতে থাকেন। তিনি বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হন। অ্যানি বেসান্তের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার ধর্মপুস্তক পাঠ করিবার আগ্রহ জন্মে। তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করেন। বি. এ. ক্লাসে পড়িবার সময় তিনি রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে দুইটি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রথম পুরস্কার পান, কিন্তু তাঁহার ধর্মানুরাগ স্বল্পস্থায়ী হয়।

রমন ওয়ালটেয়ার কলেজ হইতে মাত্র তের বৎসর বয়সের সময় এফ. এ. পাস করিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। একে বয়স কম, তাহাতে তাঁহার চেহারা খুব পাতলা ও ছোট ছিল, সুতরাং কেহই বিশ্বাস করিত না যে, তিনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। পদার্থ-বিদ্যা তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল। তিনি প্রথম বিভাগে বি. এ. পাস করেন এবং পদার্থবিদ্যায় স্বর্ণপদক পান। তিনি পদার্থবিদ্যায় প্রথম বিভাগে এম. এ. পাস করেন এবং প্রথম হন। ইতিপূর্বে কেহ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় প্রথম বিভাগে পাস করেন নাই। পাঠ্যাবস্থায় পদার্থবিদ্যায় তাঁহার দুইটি মৌলিক প্রবন্ধ বিলাতের বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এই প্রথম বিকাশ।

এই সময় রমনের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাইবার কথা হইল, কিন্তু তাঁহার দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তার নিষেধ করিলেন।

রমন ফিনান্স চাকুরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম হইলেন। এই পরীক্ষা খুব কঠিন। এইবার তিনি মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তখনকার দিনের একটি বড় চাকুরি পাইলেন।

এই সময় রমনের বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রী শিক্ষিতা ও সুন্দরী। এই বিবাহ বহুদিনের সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে হয়। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় এই বিবাহে যোগদান করেন নাই।

রমন কলিকাতায় বদলি হইয়া আসেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম-সহকারে রাজকার্য করিলেও তাঁহার মন বিজ্ঞানচর্চার দিকে পড়িয়া ছিল। তিনি মৌলিক গবেষণা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। শীঘ্রই ভগবান এই সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সন্ধান

পাইলেন। কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি এইখানে মৌলিক গবেষণা করিবার অনুমতি পাইলেন। এইখানে গবেষণা করিবার সময় তিনি কলিকাতায় বহু বৈজ্ঞানিক ও প্রভাবশালী লোকের সংস্পর্শে আসেন। তন্মধ্যে স্যার আশুতোষ ও স্যার গুরুদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তিন বৎসর কলিকাতায় ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে প্রতিটি অবসরমুহূর্ত তিনি গবেষণাগারে অতিবাহিত করেন। ইহার পর তিনি রেঙ্গুনে বদলি হইয়া যান। তিনি বিজ্ঞানের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, একদিন বিকালে শুনিলেন, রেঙ্গুন হইতে কিছু দূরে একটি নূতন যন্ত্র আসিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই যন্ত্র দেখিবার জন্য রওনা হইয়া রাত দুপুরে সেখানে পৌঁছিয়া যন্ত্রটি দেখিয়া সকালে ফিরিয়া অফিস করেন। তিনি অফিসের কাজকর্মে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার বয়স অল্প হইলেও তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সহিত কার্যপরিচালনা করিতেন। জনসাধারণের সহিত তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত সহৃদয় ছিল। অসৎ কর্মচারীদের তিনি কখনও রেহাই দিতেন না, কখনও কাহারও উপর অন্যায় আচরণ করিতেন না। রেঙ্গুনে থাকিবার সময় তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধের পর ছুটির অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণা করিয়া কাটান। ইহার পর কিছুদিন নাগপুরে থাকিবার পর তিনি পুনরায় কলিকাতায় বদলি হইলেন। এই সময় স্যার আশুতোষ কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়-বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

স্যার আশুতোষ যোগ্য লোক নির্বাচন করিবার পাকা জহুরী ছিলেন। তিনি রমনকে পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা মাত্র রমন তৎক্ষণাৎ সম্মত হন। তিনি সরকারী চাকরিতে অনেক বেশী বেতন পাইতেন এবং পর পর খুব উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু জ্ঞানের পূজারী, সত্যের সাধক কখনও অর্থের লোভে প্রলুব্ধ হন না। তাঁহার কোন বিলাতী ডিগ্রী না থাকায় প্রথমে এই পদ পাইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়। রমন এই শর্ত অপমানজনক মনে করিলেন, কিন্তু স্যার গুরুদাসের হস্তক্ষেপে এই শর্ত তুলিয়া লওয়া

হয়। রমন চাকরিতে ইস্তফা দিয়া পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

রমন অধ্যাপক হইয়া নিজ গবেষণা কার্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং ছাত্রদিগকেও এই কার্যে অনুপ্রেরণা দিতে লাগিলেন। এইজন্য ভারতের সর্বস্থান হইতে পদার্থবিদ্যা-অধ্যয়নের জন্য ছাত্র আসিতে লাগিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন—দুই স্থানেই গবেষণা চালাইতে লাগিলেন।

রমন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিলাত যান। সেখানে তিনি তাঁহার গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বিলাতের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার গবেষণার প্রশংসা করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আকাশ ও সমুদ্রের নীল বর্ণের বিষয়ে গবেষণা করিয়া সফল হন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-সংগঠনের জন্য খুব চেষ্টা করেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ বিজ্ঞান-কংগ্রেস ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই সময় ভারতের বহুস্থানে গবেষণাকার্যের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস্-সি. উপাধি প্রদান করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন।

রমন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কানাডায় যান। তিনি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বড় শহরে 'আলোক' সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সংস্পর্শে আসেন এবং বহু গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন।

রমন এই সকল দেশের হ্রদ, হিমবাহ, বরফের নদী ও পর্বতমালা দর্শন করেন। তিনি এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া কেবল যে মুগ্ধ হন তাহা নহে, তিনি এই সমস্তের মধ্যে গবেষণারও অনেক উপাদান পান। তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড ও নরওয়ে গমন করেন।

রমন দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাবানের বুদ্বুদের গঠন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁহার এই গবেষণার ফলকে রমন-ফল ( Raman

Effect ) বলা হয়। এই গবেষণার জন্য তাঁহার খ্যাতি বৈজ্ঞানিক জগতে ছড়াইয়া পড়ে।

রমন ইহার পর আমন্ত্রিত হইয়া রাশিয়ায় গমন করেন। তিনি রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানির অধিকাংশ শহর পরিদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি পদার্থবিদ্যার একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকায় পদার্থবিদ্‌গণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি এই সময় দেশীয় সঙ্গীতযন্ত্র, বিশেষতঃ বীণা ও মৃদঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া জার্মানীর এক মাসিক পত্রিকায় গবেষণার ফল প্রকাশিত করেন। এই গবেষণা সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

এই সময়ে রমন দেশ ও বিদেশ হইতে প্রচুর সম্মানলাভ করিতে থাকেন। তিনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। রোমের বিজ্ঞান-সভা তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। তৎকালীন ভারত-সরকার তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি 'রমন-ফল' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য বিলাতের ফ্যারাডে সোসাইটি কর্তৃক আহূত হন। রয়াল সোসাইটি তাঁহাকে একটি পদক প্রদান করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল ( Nobel ) পুরস্কার পান। ইহার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। ডিনামাইট-আবিষ্কারক নোবেল এইরূপ ছয়টি বিষয়ে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। প্রতি বৎসর জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রমন এখনও বাঙ্গালোরে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত আছেন। তাঁহার কর্মশক্তি অতুলনীয়। তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বলেন, "আমি বৈজ্ঞানিক হিসাবে মাত্র জীবন আরম্ভ করিতেছি। আমি মনে করি, যে বৈজ্ঞানিক পুরস্কার বা সম্মানের জন্য লালায়িত, তাঁহার কার্য শেষ হইয়াছে। এইভাবে বৈজ্ঞানিকের চলা উচিত।"

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হন। বর্তমানে তিনি সেই পদ হইতেও অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

# বীরবল সাহানী

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল লক্ষ্ণৌ শহরে শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা-গবেষণামন্দির বা পেলিও-বোটানি ইন্‌স্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহা শুধু ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই জাতীয়



প্রতিষ্ঠান। গাছপালা মাটির নীচে চাপা পড়িয়া পাথর হইয়া যায়। এই প্রস্তরীভূত ছাপকে জীবাশ্ম বা 'ফসিল' বলে। এই সকল ফসিল অনুশীলন করিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম গাছপালার কথা, পৃথিবীর বয়স, আদিম পৃথিবীর নানা রহস্যের কথা জানা যায়। এই সকল গাছপালা পৃথিবীর বুক হইতে বহুকাল পূর্বে অবলুপ্ত হইয়াছে। শুধু তাহাদের প্রস্তরীভূত ছাপ রহিয়া গিয়াছে। ফসিলের পরীক্ষা দ্বারা কয়লা ও পেট্রোল সম্বন্ধেও অনেক তথ্য জানা যায়।

যে বিজ্ঞানীর জীবনব্যাপী সাধনায় এই ইন্‌স্টিটিউট স্থাপিত হয় তাঁহার নাম বীরবল সাহানী। তিনি শুধু এই ইন্‌স্টিটিউট স্থাপনই করেন নাই, তিনি এই ইন্‌স্টিটিউটের জন্য তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাঁহার অতি কষ্টে সংগ্রহ-করা দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পুস্তকের গ্রন্থাগার দান করিয়াছেন। অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সংগৃহীত প্রত্যেকটি ফসিলও তিনি দান

করিয়াছেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, এই ইন্‌স্টিটিউট-স্থাপনের সাত দিনের মধ্যে সাহানীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। যিনি এই মহীরূহের বীজ বপন করিলেন, অঙ্কুরোদ্‌গমের পূর্বেই তাঁহাকে বিদায় লইতে হইল! এই ঘটনা খুবই শোকাবহ। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহার সাধ্বী ও সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর উপর এই ইন্‌স্টিটিউটের পরিচালনাভার দিয়া যান।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর পাঞ্জাবের ভেড়াগ্রামে এক শিক্ষিত পরিবারে সাহানীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরুচিরাম সাহানী। তিনি রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ভারতে বিজ্ঞানচর্চা জনপ্রিয় করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করেন। পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার দিকে পিতার সজাগ দৃষ্টি ছিল।

বীরবল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া লাহোর সরকারী কলেজে ভর্তি হন। লাহোরে অধ্যয়নের সময় তিনি উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার স্বনামধন্য অধ্যাপক লালা শিবরাম কাশ্যপের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি এইখানে আট বৎসর ছিলেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বৃত্তি লাভ করেন এবং মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হন। তিনি উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার অধ্যাপক স্যার অ্যালবার্ট সিউয়ার্ডের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সিউয়ার্ড বীরবলকে স্বীয় অধীত বিদ্যা সযত্নে শিক্ষা দেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বীরবল দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্‌-সি. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। বীরবল সাহানী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ডি. এস্‌-সি.।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি মাত্র এক বৎসরের জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তৎপরে তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ও ভূতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত

হন। তিনি নিজে তো নানারকম মৌলিক গবেষণা করিতেনই, উপরন্তু ছাত্রদিগের মধ্যেও গবেষণাস্পৃহা যাহাতে জাগ্রত হয়, তাহার জন্য তিনি সর্বদাই ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার পরিচালনায় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার গবেষণাগার এক উচ্চশ্রেণীর অনুশীলনকেন্দ্রে পরিণত হয়।

অধ্যাপক সাহানীর খ্যাতি ক্রমে দেশের সীমানা ছাড়াইয়া বিদেশেও পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ষষ্ঠ ভারতীয় সভ্য মনোনীত হন। এই বৎসরই এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে 'বার্কলে' পদক প্রদান করেন।

বীরবল ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ইহার পূর্বে তিনি একবার ভূতত্ত্ব, আর একবার উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতের কয়েকটি বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানে সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ্যামস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান-সম্মেলনে প্রত্ন-উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (পেলিও-বোটানি) শাখার সভাপতিত্ব করেন। ইহা ভারতের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গবেষণাগার দেখিয়া আসিবার জন্য তিনি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত হন। তিনি আরও একবার লণ্ডনে অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিমালয়ের গাছপালা —অতীত ও বর্তমান'—এই পর্যায়ে কতকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বহুকোটি বৎসর পূর্বে দক্ষিণ এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা লইয়া একটি মহাদেশ ছিল, ইহার নাম ছিল 'গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড'। অধ্যাপক সাহানী তাঁহার সংগৃহীত বহু ফসিলের উপর ভিত্তি করিয়া গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। রাজমহল পাহাড়ের ফসিল সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বীরবলের মৃত্যুতে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

## শ্রীনিবাস রামানুজন

অবস্থার বিপাকে পড়িয়া উচ্চশিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত হইয়াও প্রতিভা ক করিয়া বিকাশ লাভ করে, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক রামানুজন। তিনি মাত্র ৩৩ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই স্বল্প-কালমধ্যে তিনি দেশে ও বিদেশে যে সম্মান লাভ করেন, তাহা জগতের যে কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে গৌরবের বিষয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'লণ্ডন টাইম্‌স্' পত্রিকা মন্তব্য করেন, "যে কোন প্রতিভার অকালমৃত্যু, বিশেষতঃ যখন প্রতিভা সবেমাত্র সমাদৃত হইতেছে, সেই সময় প্রতিভার বিদায়-গ্রহণ খুবই পরিতাপের বিষয়।"



রামানুজন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারতের ইরোদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ সামান্য বেতনের কেরানী ছিলেন। তাঁহার মাতা বেলিফের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। রামানুজন অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার প্রতিভার জন্য মাতাপিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে কিছুই পান নাই। তিনি কুম্ভকোণমের টাউন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা পান। তিনি স্কুলে অধ্যয়নের সময় শান্তপ্রকৃতি ও চিন্তাশীল ছিলেন। এই সময়ে

তিনি কঠিন অঙ্কের সমাধান করিতেন। তাঁহার সহপাঠীরা বা শিক্ষকগণ এই বিষয়ের কিছুই জানিতেন না। তিনি বার বৎসর বয়সের সময় লোনির ত্রিকোণমিতির অঙ্কগুলি অন্যের সাহায্য ব্যতীত কষিয়া ফেলিয়া সকলকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পর তিনি উচ্চপর্যায়ের অঙ্কশাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন।

তিনি অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া অন্য বিষয়ের আলোচনা করিতেন না। সেইজন্য সতর বৎসর বয়সে কুম্ভকোণমের সরকারী কলেজে একটি বৃত্তি লাভ করিলেও ইংরাজী ভাল না জানায় তাঁহার বৃত্তি প্রত্যাহার করা হয়। অসচ্ছলতার দরুন তাঁহাকে কলেজের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া জীবিকার অন্বেষণে যাইতে হয়। বহুদূরের একটি ছোট শহরে তিনি সাময়িকভাবে একটি চাকরি পান। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের জন্য ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। তথাপি এই সময়েও তিনি অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণা চালাইয়া যান।

এই সময়ে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ রামচন্দ্র রাও-এর সহিত রামানুজনের সাক্ষাতের মর্মস্পর্শী বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

"ক্ষুদ্রাকৃতি, কুৎসিত ও স্থূল আকৃতিবিশিষ্ট, উজ্জলচক্ষুযুক্ত একটি লোক আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সে অতীব দরিদ্র। সে কুম্ভকোণম্ হইতে মাদ্রাজে গবেষণা চালাইবার অবকাশের জন্য চলিয়া আসে। সে কখনও খ্যাতির জন্য লালায়িত নহে। সে চায় জীবন-ধারণের জন্য খোরাক ও গবেষণার জন্য সুযোগ। সে তাহার গবেষণার বিষয় সম্পর্কে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, সে এত অল্প বয়সে নূতন জিনিস আবিষ্কার করিয়াছে।"

রামচন্দ্র রাও মাদ্রাজের পোর্ট ট্রাস্টের সভাপতিকে একখানি পরিচয়পত্র দিয়া লেখেন যে, এইরূপ একটি প্রতিভাকে ধ্বংস হইতে দেওয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্য।

সাহেব সভাপতি মহাশয় রামানুজনকে মাদ্রাজে পোর্ট ট্রাস্টে একটি চাকরিতে বহাল করেন। এই সময়ে সভাপতি রামানুজনের গবেষণার প্রবন্ধগুলি ডাক্তার ওয়াকার নামক এক বৈজ্ঞানিককে দেখান। তিনি

তাঁহার গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া যান এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় রামানুজনকে যেন এমন সাহায্য করেন, যাহাতে তিনি জীবিকার জন্য না ভাবিয়া গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে মাসিক ৭৫৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করে। রামানুজন এইবার নিরুদ্বেগে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁহার গবেষণার প্রবন্ধ কেম্ব্রিজের বিখ্যাত অধ্যাপক হার্ডির নিকট প্রেরণ করেন। হার্ডি তাঁহার অসাধারণ মৌলিক কার্যে মুগ্ধ হন। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্র দেন। তিনি রামানুজনকে কেম্ব্রিজে যাইয়া উচ্চ পর্যায়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রামানুজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। তিনি বিলাত যাইতে অসম্মত হন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক মিঃ নেভিল ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি রামানুজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কেম্ব্রিজ যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পত্র দেন। তাহাতে তিনি অন্য কথার মধ্যে লেখেন, "রামানুজনের প্রতিভার আবিষ্কার আমাদের বর্তমান গণিতশাস্ত্রের জগতে একটি সর্বপ্রধান ঘটনা।........ গণিতের ইতিহাসে তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে।"

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে দুই বৎসরের জন্য বৎসরে ২৫০ পাউণ্ডের একটি বৃত্তি দেওয়া হয়। রামানুজন বিলাতে যাইয়া বিদ্যার্জনের উপকারিতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইংলণ্ডে রওনা হইয়া গেলেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ভর্তি হন এবং অধ্যাপক হার্ডির পরিচালনায় গবেষণাকার্যে প্রবৃত্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও তাঁহাকে ৬০ পাউণ্ডের একটি বৃত্তি দেওয়া হয়। মিঃ হার্ডি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে রামানুজন সম্পর্কে লেখেন, "তাঁহার মত মেধাবী ছাত্রের পক্ষে একজন শিক্ষক পর্যাপ্ত নহে। আমার জানা গণিতবিদ্‌গণের মধ্যে তিনিই হইলেন প্রধানতম।"

রামানুজন মাছমাংস স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে মাছমাংস আহার না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা করা অসম্ভব। সেইজন্য

ইংলণ্ডে যাইয়া রামানুজনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি শীঘ্রই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁহাকে স্যানিটোরিয়ামে বাস করিতে হয়।

ইতিমধ্যে রামানুজনের খ্যাতি বৈজ্ঞানিক জগতে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'এফ. আর. এস.' বা রয়াল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। ইহাই বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ইংলণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। তিনি ভারতের প্রথম এফ. আর. এস.। তিনি রয়াল সোসাইটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ এফ. আর. এস.। একজন অজ্ঞাতনামা ভারতীয় হঠাৎ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করায় জগৎ বিস্মিত হইল। এই সম্মানে উৎসাহিত হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি গবেষণাকার্য চালাইয়া যান। এই বৎসরই তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন এবং বৎসরে ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি পান। এই সময় মিঃ হার্ডি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখেন, "রামানুজন এত সম্মান লইয়া ভারতে যাইবেন, যাহা কোন ভারতীয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।"

তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, জাহাজে করিয়া ভারতে আসা নিরাপদ ছিল না। যুদ্ধ শেষ হইলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই পৌঁছেন। তখন তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দিন দিন তাঁহার জীবনীশক্তি ফুরাইয়া আসিল। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা রক্ষা করিতে পারিল না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

রামানুজন নিরহঙ্কার ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বর্তমান জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্ বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বড়ই অনুশোচনার কথা যে, এত বড় প্রতিভা উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে অকালে পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন।

# উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

আসামে ও বাংলায় কালাজ্বর একটি মারাত্মক ব্যাধি ছিল। বহুলোক এই ব্যাধির কবলে প্রাণ দিয়াছে। যে মহাপ্রাণ বৈজ্ঞানিক এই ব্যাধির নিদান আবিষ্কার করিয়া হাজার হাজার লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনিই হইলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।



১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন জামালপুরে উপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুল ও কলেজে তিনি বহু পদক ও বৃত্তি লাভ করেন এবং বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন এবং গণিতশাস্ত্রে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র একসঙ্গেই অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. উপাধি প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'মেডিসিন' ও 'সার্জারি'তে প্রথম স্থান অধিকার করায় গুডিফ ও

ম্যাকালওড পদক লাভ করেন। তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এম. ডি. এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিজিওলজিতে পি. এইচ-ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কোট্‌স্‌ মেডেল, গ্রিফিথ প্রাইজ, মিণ্টো মেডেল ইত্যাদি বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের 'প্যাথলজি' ও 'মেটিরিয়া মেডিকা'র শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ( অধুনা স্যার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ) 'মেডিসিন'-এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর চাকরি করেন। এইখানেই তিনি কালাজ্বর সম্বন্ধে অধিকাংশ গবেষণা এবং জগদ্বিখ্যাত ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' আবিষ্কার করেন। ইহা ব্যতীত তিনি ম্যালেরিয়া, 'ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার' প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করেন। রসায়নশাস্ত্রেও তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। তাঁহার রচিত 'A Treatise on Kalazar' বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি ডাঃ কর্লমেনস-এর জার্মান গ্রন্থে কালাজ্বর নামক অধ্যায়টির রচনা করেন।

গভর্নমেণ্ট উপেন্দ্রনাথকে তাঁহার আবিষ্কারের জন্য 'নাইট' উপাধি দেন। তিনি বহুবিধ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি 'রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিন'-এর সভ্য ছিলেন।

বিজ্ঞান যে মানবের কতখানি কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহা উপেন্দ্রনাথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

## স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর

"শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ভারতে বিজ্ঞান-অনুশীলনের জন্য যত কাজ করিয়াছেন, কোন যুগে কোন দেশের বিজ্ঞান-বিবর্তনের ইতিহাসে একজন মানুষের দ্বারা ততখানি কাজ হয় নাই।"—বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইরিন জলিয়ো কুরি শান্তিস্বরূপের সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রয়ারি শান্তিস্বরূপ পাঞ্জাবের শাপুর জেলায় ভেড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি সিকন্দ্রাবাদে তাঁহার মাতামহ মুন্সী পিয়ারী লালের কাছে মানুষ হন। শৈশবে তিনি অতি দুষ্ট-



প্রকৃতির ছেলে ছিলেন। গাছে চড়িয়া আম খাইতে এবং নদীতে বা পুকুরে সাঁতার কাটিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। মুন্সীজী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। শান্তিস্বরূপ মাতামহের ড্রইং করিবার যন্ত্রপাতিগুলি লইয়া খেলা করিতেন। এই যন্ত্রপাতি তাঁহার মনে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা ও অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিল! সিকন্দ্রাবাদের মক্তবে তাঁহার লেখাপড়া আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি লাহোর কলেজে ভর্তি হন।

শান্তির পিতা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে ত্যাগ করেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে শান্তির কোন অধিকার ছিল না,

এমন কি পিতৃবংশীয়দের স্নেহেও তিনি বঞ্চিত হন। শান্তির পিতা পরমেশ্বরী সহায় সামান্য বেতনের শিক্ষক ছিলেন। সেইজন্য মৃত্যু-কালে তিনি অসহায় স্ত্রীপুত্রের জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। লাহোরে শান্তির উচ্চশিক্ষার ভার বহন করিবার মত সচ্ছল অবস্থা তাঁহার মাতামহের ছিল না। সুতরাং শান্তি প্রথমে খুব অসুবিধায় পড়িলেন। তিনি প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করিলে কিছুটা সুবিধা হয়। অতঃপর তিনি ছাত্রজীবনে কর্মক্লান্ত দিনের অবসরসময়ে ছাত্র পড়াইয়া, কলেজে ডিমনস্ট্রেটরগিরি করিয়া বা অন্য কাজ করিয়া পড়িবার খরচ যোগাইতেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মমতে শান্তির সহিত লাজবন্তীর শুভপরিণয় হয়। লাজবন্তীর পিতা রায়সাহেব রঘুনাথ সহায় শিক্ষক ছিলেন। সেইজন্য লাজবন্তীর শিক্ষার উপর খুব অনুরাগ ছিল। আজীবন শান্তি তাঁহার কাছে উৎসাহ ও সাহায্য পান। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর কলেজ হইতে এম. এস-সি. পাস করিবার পর বিদেশে পাঠ করিবার জন্য শান্তি 'দয়াল সিং বৃত্তি' লাভ করেন।

শান্তি লণ্ডন শহরের র‍্যামসে ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানাচার্য ডনানের অধীনে গবেষণা করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি. ডিগ্রী পান। আচার্য ডনান শান্তিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

শান্তি ছাত্রজীবন হইতে ভাবিতেন যে জ্ঞানার্জনই শেষ কথা নয়। জ্ঞানকে কার্যকর করিয়া জনহিতসাধনে নিযুক্ত করিতে না পারিলে জ্ঞানের কোন মূল্য থাকে না। তিনি পরবর্তী জীবনে দেশের সম্পদ্‌কে জনসেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি লণ্ডনে পাঠ সমাপ্ত করিয়া দুইবার ফ্রান্স ও জার্মানিতে যাইয়া বহু বৈজ্ঞানিকের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ইংলণ্ডে পাঠকালে সায়েন্টিফিক ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ফাণ্ড হইতে সাহায্য পান।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর আমন্ত্রণে শান্তি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। শিক্ষা-দীক্ষার পাদপীঠ বারাণসী শান্তির বিজ্ঞানবীজ-রোপণের প্রথম ক্ষেত্র।

এইখানে তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা আরম্ভ করেন। তাঁহার অনেক সুযোগ্য শিষ্যও জুটিল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া কয়েক বৎসর পর লাহোর কলেজে যোগদান করেন। লাহোরের রসায়নাগার শান্তির কর্মভূমি ও সাধনার পীঠ। এইখানে তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার গবেষণায় নিযুক্ত হন। তিনি শুধু গবেষণাই করিতেন না, পরন্তু ফলিত রসায়নে ও রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত নানা সমস্যার সমাধান করিয়া দেশে অর্থাগমের সুবিধা করিয়া দেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে চৌম্বক রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান আটকে তৈলের সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু আটকে মাটির নীচে লবণ থাকায় যন্ত্রগুলি মাটির স্তর ভেদ করিয়া বেশী দূর যাইতে পারিত না। ডাঃ ভাটনগর এই সমস্যার সমাধান করিয়া দেন। এই প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে দেড় লক্ষ টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলে নির্লোভ ও সত্যের পূজারী সেই অর্থ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে অনুরোধ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি পুনরায় লণ্ডনে যান। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত তৈল প্রতিষ্ঠান তাঁহার গবেষণার জন্য তাঁহাকে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন এবং জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ড ঘুরিয়া তাঁহাদের কারখানা দেখিবার সমস্ত খরচ বহন করেন। তিনি ১৯৩২-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রসায়ন-শিল্পের বহু সমস্যার সমাধান করেন। এই সকল কাজের জন্য তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সায়েন্স কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি মনোনীত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের কাঁচামালকে বিজ্ঞানের সাহায্যে যুদ্ধসম্ভারে পরিণত করার সংকল্প করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ডাঃ ভাটনগর এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তাঁহার নেতৃত্বে গবেষণার ফলে বহু জ্ঞানলাভ হয়। এই সময় তিনি বহু সম্মানে

ভূষিত হন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'চৌম্বক রসায়ন' রচনা করেন।

মানুষ হিসাবে ডাঃ ভাটনগরের আদর্শ খুব উচ্চ ছিল। অর্থে তাঁহার কোন লোভ ছিল না। উচ্চপদ তাঁহাকে গর্বিত করিয়া তোলে নাই; যশস্বী হইয়াও তিনি বিনয়ী, শিষ্টাচারী ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক হইয়াও তিনি সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। তিনি উর্দু ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লাজবন্তীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্মৃতি স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য 'লাজবন্তী' নাম দিয়া তিনি একখানি কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি উর্দুতে 'কেরামতি' নামক একখানি নাটকও রচনা করেন।

ডাঃ ভাটনগর খুব ভাল বক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ভঙ্গি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং ভাষা সুমার্জিত ও প্রাঞ্জল ছিল।

ডাঃ ভাটনগরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতে প্রায় তেরটি জাতীয় গবেষণা-শালা-প্রতিষ্ঠা। ভারত গভর্নমেণ্ট এই সমুদয়ের ব্যয়ভার বহন করেন এবং এই সমুদয়ে অনেকের প্রচুর দানও আছে। এই সব গবেষণাশালায় দেশ-বিদেশ হইতে বহু বৈজ্ঞানিক আসিয়া দেশের সম্পদ্‌কে জনকল্যাণে লাগা-ইবার কাজে ব্যাপৃত আছেন। ডাঃ ভাটনগরের অদম্য উৎসাহ, অপরিসীম অধ্যবসায়, অফুরন্ত কর্মশক্তির জন্য এই প্রচেষ্টা সফল হয়। তিনি ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও গবেষণাশালাসমূহের কার্যের পরিচয় জানাইবার জন্য 'ওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। বহু বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা এই সমস্ত গবেষণাশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কাচশিল্প, জ্বালানিশিল্প, ধাতববিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যার জন্য গবেষণাশালাসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে ভাটনগরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ডাঃ ভাটনগর কর্মময় জীবনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

# অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

যে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নাম জগদ্বিখ্যাত আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া গিয়াছে, তিনি হইলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল কাঁচড়াপাড়ার নিকটে। কলিকাতার গোয়াবাগানেও তাঁহাদের বাড়ী ছিল। তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি গোয়াবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ সরকারী চাকুরি করিতেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যুতে সত্যেন্দ্রনাথের পিতার উপর সংসারের দায়িত্ব পড়ে। এইভাবে খুব



অনটনের মধ্যে তাঁহার বাল্যজীবন শুরু হয়। তাঁহার পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু খুব উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়সেই পড়াশুনা আরম্ভ করেন। অন্য দুই-একটা স্কুলে পড়িয়া তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার তীক্ষ্ণতায় তিনি শিক্ষকগণকে বিস্মিত

করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সহপাঠীর সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিত ছাড়াও সাহিত্য ও দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

এই সময় স্যার আশুতোষের উদ্যোগে কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ এই কলেজে পদার্থ বিদ্যার লেকচারার নিযুক্ত হন। ইহার কিছুদিন পূর্বে আইনস্টাইন তাঁহার 'আপেক্ষিকতাবাদ' (Theory of Relativity) প্রচার করেন। পদার্থবিদ্যার এই নূতন চিন্তাধারা তাঁহার মনে গবেষণার প্রেরণা যোগায়। এই বিষয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি তথাকার পদার্থ বিদ্যার রীডার হইয়া ঢাকায় চলিয়া যান। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইউরোপে প্রেরিত হন। এই সময় আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে প্যারিসে যান। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হয়। লেভির নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া তিনি মাদাম কুরী প্রমুখ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি কয়েকটি ল্যাবরেটরিতে পদার্থবিজ্ঞানে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের অধীনে গবেষণা করিয়া দক্ষতা অর্জন করেন। উচ্চ গণিতে তাঁহার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি দেখিয়া সকল বৈজ্ঞানিকই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও পরে বিজ্ঞানের ডীন নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীনে বহু ছাত্র গবেষণা করিতে থাকেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ইমেরিটস অধ্যাপক পদে বৃত করে।

মানুষ হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অমায়িক ও বিনয়ী। তাঁহার সৌজন্য ও দরদী মন সকলকেই মুগ্ধ করে। তিনি সকল বিষয়েই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। হাফ শার্ট, ধুতি ও স্যাণ্ডেল—এই ছিল তাঁহার সাধারণ পোশাক।

তিনি ছাত্রদিগকে স্নেহকোমল মিষ্ট ভাষায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্ হইলেও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল খুব বিস্তৃত। তিনি গণিত ও রসায়নশাস্ত্রেও গবেষণা করেন। তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি ছিলেন সভাপতি। তিনি বাংলায় বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে রাজ্যসভার (কাউন্সিল অফ স্টেটের) সদস্য নির্বাচিত হন।

সত্যেন্দ্রনাথের যে গবেষণার জন্য এত খ্যাতি, তাহা অত্যন্ত জটিল। সামান্য কথায় এই তথ্য এই রকম: প্রত্যেক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম কণা দিয়া গঠিত। ইহাদিগকে পরমাণু (atom) বলে। আবার পরমাণু আরও সূক্ষ্মতর কণাসমূহ দিয়া গঠিত। ইহাদিগকে ইলেক্‌ট্রোন, প্রোটোন প্রভৃতি বলে। পরমাণুর মধ্যে ইলেক্‌ট্রোনগুলি অতি দ্রুতগতিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু এই গতিবেগ সাধারণ নিয়ম-মাফিক চলে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ নূতন নিয়ম-আবিষ্কারে নিযুক্ত হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম এই আবিষ্কার করেন। বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ এই নিয়মের নামকরণ করেন 'বসু-পরিসংখ্যান' (Bose Statistics)। এই পরিসংখ্যান নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সৌধ নির্মিত হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন স্বদেশপ্রেমিক ও ছাত্রবৎসল বিজ্ঞানী। স্বদেশী দ্রব্যপ্রস্তুতে ও ব্যবহারে তিনি খুব উৎসাহ দেন। অনেক স্বদেশী প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি পায়। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি ভারত-সরকারের জাতীয় গবেষণাগারে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

## ডাঃ মেঘনাদ সাহা

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশে স্বদেশী আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছে। ছাত্রগণের মধ্যেও ইহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটি ছেলে খালি পায়ে স্কুলে যাইত। ইন্‌স্‌পেক্‌টারের নির্দেশক্রমে প্রধান শিক্ষক হুকুম করিলেন যে, তাহাকে জুতা পায়ে দিয়া আসিতে হইবে। স্বাধীনচেতা ছেলেটি এই আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিল। ছেলেটি বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইল। এই ছেলেটিই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা।



১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে মেঘনাদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ সাহা গ্রামে সামান্য ব্যবসায় করিতেন, অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল। অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে মেঘনাদের শৈশব কাটিয়া যায়। তিনি প্রথমে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি নিজ গ্রাম হইতে সাত মাইল দূরে শিমূলিয়া নামক স্থানে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁহার পিতার অবস্থা এমন নয় যে, তিনি অন্য কোথাও ছেলেকে খরচ দিয়া রাখিয়া পড়াইতে পারেন। ভাগ্যক্রমে এই সময় মেঘনাদের একটি আশ্রয় জুটিল। শিমূলিয়া গ্রামের ডাঃ অনন্তকুমার দাস তাঁহার বাটীতে বিনা খরচে

মেঘনাদের বাসস্থানের ও তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিলেন। মেঘনাদ এই বিদ্যালয় হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাসে ৪৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি পাওয়ায় তাঁহার পড়াশুনার খুব সুবিধা হয়। কারণ, পুত্রের পড়াশুনার কোনরূপ ব্যয় বহন করার সাধ্য তাঁহার পিতার ছিল না।

মেঘনাদ ঢাকায় যাইয়া প্রথমে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি এই স্কুল হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তিনি ঢাকা জুবিলি স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় তিনি ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের বাইবেল পরীক্ষা দিয়া বাংলায় প্রথম হইয়া একশত টাকা পুরস্কার পান। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান এবং ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পান।

মেঘনাদ ঢাকা কলেজে আই. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আই. এস-সি. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ২৫৲ বৃত্তি পান। এই সময় তিনি জার্মান ভাষা অধ্যয়ন করেন। ঢাকা কলেজে তাঁহার বিশিষ্ট অধ্যাপকদের মধ্যে ইংরেজীর অধ্যাপক আর্চবোল্ড ও রসায়নের অধ্যাপক ওয়াটসন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আই. এস-সি. পরীক্ষায় গণিত ও রসায়নে প্রথম হইয়াছিলেন।

অতঃপর মেঘনাদ কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণিতে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফলিত গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হইয়া এম.এস্-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে তাঁহার সতীর্থদিগের মধ্যে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যেক পরীক্ষায় খুব প্রতিযোগিতা চলিত।

মেঘনাদ ছাত্রজীবনে অনেক বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( বাঘা যতীন ) ও পুলিন দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার অজুহাতে তিনি ফাইনান্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পান না। ইহাতে তাঁহার জীবনে সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দিল। তিনি কর্মজীবনের পথের সন্ধানে ছিলেন। তিন বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ তাঁহাকে নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার লেকচারার নিযুক্ত করেন। তিনি এই পদে যোগদান করিয়া অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাকার্যেও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গবেষণার জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডি. এস্-সি. ডিগ্রী এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি আপেক্ষিক তত্ত্ব ও আলোর ভর ( mass ) বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য এই ডিগ্রী ও বৃত্তি পান। তাপের প্রভাবে কিভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অণু গঠিত হয়, তাঁহার গবেষণা সেই তথ্য উদ্‌ঘাটন করে। এই আবিষ্কারে বিজ্ঞানজগতে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। তিনি তাঁহার নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিতে সূর্য ও নক্ষত্রের গঠন-পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত পদ্ধতি বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার আবিষ্কার গত তিন শত বৎসরেব মধ্যে বড় বড় দশটি আবিষ্কারের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এই আবিষ্কারে তিনি উৎসাহিত হইয়া জীবনের পথ স্থির করিয়া লন। তিনি এই বৎসরেই গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। তিনি লণ্ডনে অধ্যাপক ফাউলারের অধীনে এবং জার্মানীতে অধ্যাপক নার্নস্টের অধীনে কিছুকাল গবেষণা করেন। এই সময়ে তিনি কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সহিত একত্রে গবেষণাকার্য করেন।

মেঘনাদ স্বদেশে ফিরিয়া বিজ্ঞান কলেজে খয়রা অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং এই পদে কিছুদিন থাকার পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এইখানে তিনি একটানা পনর বৎসর পদার্থবিদ্যায় গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থাকেন এবং

অনেক মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে তাঁহার নূতন তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান।

এই সময়ে মেঘনাদ দেশে ও বিদেশে প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান এফ. আর. এস. উপাধিতে ভূষিত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর। ইহা ছাড়া তিনি ফ্রান্সের জ্যোতির্বিদ-পরিষদের আজীবন সভ্য এবং লণ্ডন পদার্থবিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের ফাউণ্ডেশন-ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে ইতালির ভোল্‌টার শতবার্ষিকী স্মৃতি-উৎসবে যোগদান করেন। তিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দ্বারা গঠিত শুভেচ্ছা-মিশনের একজন প্রতিনিধি হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহা ছাড়া তিনি বহুবার আমন্ত্রিত হইয় বিদেশে বক্তৃতা দিয়াছেন।

মেঘনাদের উদ্যোগে ভারতে অনেক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ন্যাশনাল একাডেমি অব্ সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। তিনি তিনটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন।

এলাহাবাদে মেঘনাদ স্কুল অব্ ফিজিক্স নাম দিয়া পদার্থবিদ্যা গবেষণার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অনেক ছাত্র গবেষণা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি 'Science and Culttre' নামক একখানি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সমস্যার আলোচনা হয়।

মেঘনাদ শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিষয়েই গবেষণা করিতেন না, ব্যাবহারিক বিজ্ঞান দ্বারা কিভাবে জাতির কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়, তিনি সে বিষয়েও গবেষণা করিতেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদ পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত

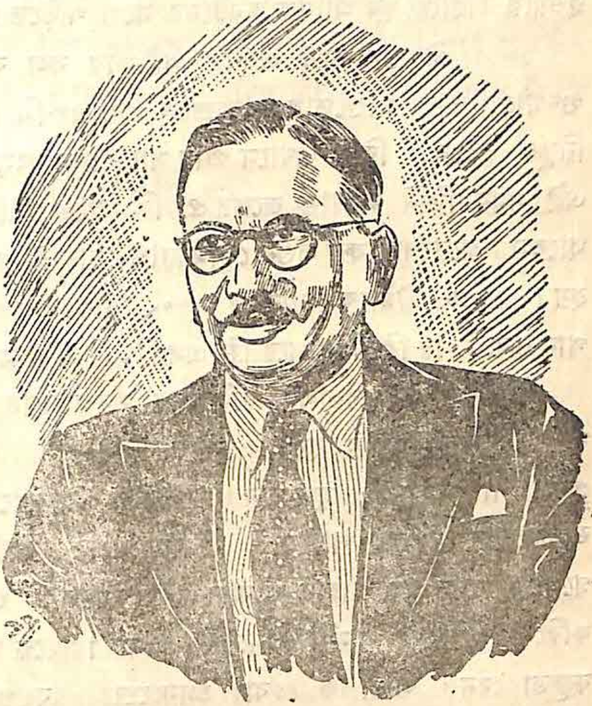
অধ্যাপকের পদে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্‌স্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন থাকিলেও সাধারণ মানুষের দুঃখদৈন্য তাঁহার অন্তরকে ব্যথিত করিত। দামোদরের বন্যার সময়, উত্তরবঙ্গে বন্যার সময়, ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেঘনাদ বহু পরিকল্পনা-সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় লোকসভার সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। তাঁর এই মৃত্যু সত্যই মর্মান্তিক।

## ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে সকল রসায়নবিদ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম।



১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর জ্ঞানচন্দ্র পুরুলিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি বাসস্থান হুগলী জেলার আলমবাটী গ্রামে। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র ঘোষ কন্ট্রাক্টর ও অভ্রব্যবসায়ী ছিলেন। সেই কারণে তিনি সপরিবারে ছোটনাগপুরের অভ্রখনি-অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানচন্দ্র গিরিডি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। স্কুলে মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছোটনাগপুর বিভাগ হইতে প্রথম হইয়া এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হন। অসাধারণ মেধার জন্য তিনি শীঘ্রই আচার্য রায়ের প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আচার্য রায়ের সহিত গড়ের মাঠে বেড়াইতেন। এই সাহচর্যই জ্ঞানচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আই. এস-সি. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বি. এস্-সি পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এম. এস্-সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সকল পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে খুব আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়িতে হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এম. এস্-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ জ্ঞানচন্দ্রকে এম. এস-সি. ক্লাসে পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি এখানে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অধ্যাপনা করেন। এই সময় তিনি লবণাক্ত জলের প্রকৃতি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। গবেষণার ফল লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানচন্দ্র ৫০০৲ টাকার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং ইহার কিছুদিন পরে ডি. এস-সি. ডিগ্রী পান।

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য স্যার ফিলিপ হার্টগের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি জ্ঞানচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহার অনুরোধে স্যার আশুতোষ জ্ঞানচন্দ্রকে বিলাত পাঠান। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন গবেষণা করেন এবং তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। জ্ঞানচন্দ্র বার্লিন গমন করিলে অধ্যাপক নার্নস্ট জ্ঞানচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে জার্মান ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক হেবার জ্ঞানচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এইখানে তিনি জড়পদার্থের উপর আলোকরশ্মির প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতি মনোনীত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে অধরচন্দ্র মুখার্জি মেমোরিয়াল বক্তৃতা দেন। জ্ঞানচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় অনেক ছাত্র মৌলিক গবেষণা করিয়া যশস্বী হন।

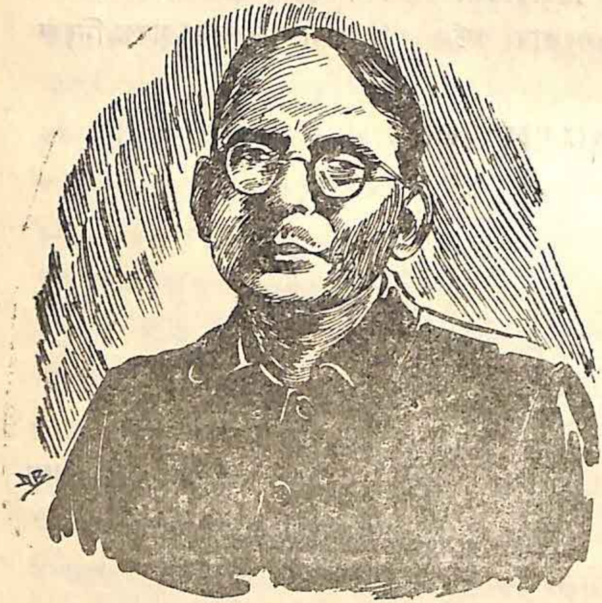
জ্ঞানচন্দ্র ইণ্ডিয়ান রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের মন্ত্রণা-পরিষদের, জাতীয়

পরিকল্পনা কমিটির ও যুক্ত বাঙ্গলার শিল্প-পরিকল্পনা কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালোর সায়েন্স ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। পরে তিনি ভারত-সরকারের শিল্প-ডিরেক্টর এবং হিজলীর ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্‌নলজির ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ হইতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর ভারত-সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

## ডাঃ নীলরতন ধর

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি নীলরতন যশোহর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীপ্রসন্নকুমার ধর যশোহরে ব্যবহারজীবী ছিলেন। নীলরতন তাঁহার ছয় ভ্রাতা ও তিন ভগিনীর মধ্যে তৃতীয়।



নীলরতন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পড়াশুনা করেন এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজ হইতে আই. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই দুই পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পান। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস-সি পরীক্ষায় রসায়নে অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসর এম. এ. ও এম. এস-সি. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করায় ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ও দশটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি এই টাকার কিয়দংশ দিয়া তাঁহার এক বন্ধুর পাঠ্যপুস্তক কিনিতে সাহায্য করেন। ইহা ছাড়া তিনি গ্রিফিথ প্রাইজ ও ইলিয়ট মেডেল প্রাপ্ত হন। তিনি এম. এস-সি. পরীক্ষায় ভৌত রসায়নে ( Physical Chemistry ) গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। তিনি এম. এস-সি. পাস করিবার

পর প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে রসায়নে গবেষণাকার্য করিতে থাকেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন ভারত-সরকারের বৃত্তি পাইয়া লণ্ডনে যান। সেখানে দেড় বৎসর গবেষণা করিয়া মাত্র ২৫ বৎসর বয়সেই তিনি ডি. এস-সি. ডিগ্রী পান। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নূতন গবেষণা করিয়া প্যারিসের 'স্টেট ডক্টরেট' উপাধি পান। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিদেশীকে সাধারণতঃ এই উপাধি দেন না। নীলরতন লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন শিক্ষাবিভাগে সর্বোচ্চ গ্রেডের চাকরি পান এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি প্রায় বিশ বৎসর কার্য করিয়াছেন এবং অদম্য উৎসাহে ও উদ্যমে নিজে ও ছাত্রগণদ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকার্য চালাইয়া ছিলেন। তাঁহার অধীনে গবেষণা করিয়া বহু ছাত্র ডি. এস-সি. ডিগ্রী পাইয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যরূপে কার্য করিয়াছেন। তিনি দুই বৎসর ন্যাশনাল একাডেমি অব্ সায়েন্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হিসাবেও কাজ করেন।

নীলরতন সাতবারেরও বেশী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে গবেষণা করেন: অনুঘটন ( Catalysis ), কলয়েড রসায়ন, ফোটো রসায়ন, বায়ো-কেমিস্ট্রি, খাদ্য, কৃষি ও নাইট্রোজেন। কৃষি ও নাইট্রোজেন সংক্রান্ত তাঁহার আবিষ্কারগুলি বিদেশে সমাদৃত হয়। তিনি আন্তর্জাতিক সার ( manure ) সম্মেলনের সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতে ভৌত রসায়নে গবেষণার প্রবর্তক। তিনি গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অর্ধেক গম ও অর্ধেক চাউল প্রকৃষ্ট খাদ্য।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন স্বীয় ছাত্রী শ্রীমতী শীলাকে বিবাহ করেন।

তাঁহার স্ত্রীও এম. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনিও রসায়নে গবেষণা করেন।

নীলরতন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। গুরুর নিকট হইতে তিনি শুধু গবেষণার প্রেরণাই লাভ করেন নাই, গুরুর মত তিনিও অতি সরলভাবে জীবন যাপন করেন। গুরুর মত তিনিও আত্মভোলা, অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার ও অমায়িক। এক কথায়, তাঁহাকে 'মাটির মানুষ' বলা যায়। এই সকল গুণের জন্য তাঁহাকে 'সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক' বলা হয়। সংসারে সকলের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা অসীম। তিনি দ্বিতীয় ভগিনীর বিবাহে স্বর্ণপদক ভাঙ্গাইয়া গহনা প্রস্তুত করাইয়া দেন। তিনি সকল ভ্রাতাকে সুশিক্ষিত করান। ছাত্রদিগের তিনি একাধারে গুরু, বন্ধু ও সাহায্যদাতা। কোন দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্য হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই।

তাঁহার পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বাড়ীর নিকটে শীলা ধর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে মাটি সম্বন্ধে গবেষণা হয়। এই গবেষণাগারটি দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার সাত বৎসরের মাহিনার প্রায় এক লক্ষ টাকা এই প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছেন। তিনি ন্যাশনাল একাডেমির জন্য তাঁহার গৃহসংলগ্ন ভূমি দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, যশোহর কলেজেও অনেক টাকা দান করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানের কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

## ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণান

ডাঃ কৃষ্ণান প্রথম জীবনে মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৌলিক গবেষণা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে সেইখানে অধিক দিন রাখিতে পারিল না। কলিকাতায় সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে ('ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স') সি. ভি. রমনের অধীনে যে সকল উৎসাহী কর্মী গবেষণা-কার্য চালাইতে-ছিলেন, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করেন। এখানে অনুকূল পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইতে লাগিল এবং তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর এখানে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন।



১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার নিযুক্ত হন। সেখানে পাঁচ বৎসর কৃতিত্বের সহিত চাকরি ও গবেষণা করিবার পর তাঁহার পূর্ব কর্মস্থল কলিকাতায় তিনি ফিরিয়া আসেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সি. ভি. রমন কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে তিনি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের নব-প্রবর্তিত মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সি. ভি. রমনের নেতৃত্বে অ্যাসোসিয়েশনে যে সমস্ত গবেষণাকার্য

হইতেছিল, তিনি তাহার ধারা অব্যাহত রাখেন। 'দৃষ্টি-সম্পর্কিত আলোক-বিজ্ঞান' ( Optics ), বিশেষভাবে 'স্ফটিকের চৌম্বক শক্তির প্রভাব' (Influence of magnetism of Crystals) সম্পর্কে তাঁহার গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নিযুক্ত হন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নয়াদিল্লীস্থিত জাতীয় পদার্থবিদ্যা-গবেষণা-মন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং তদবধি তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

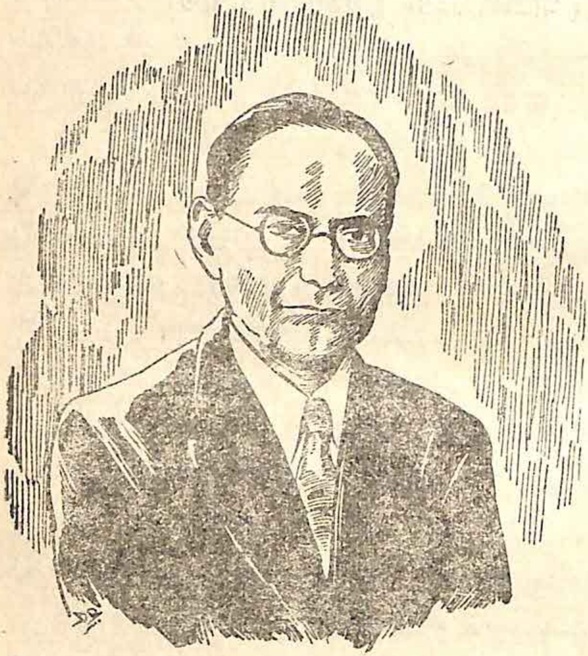
সি. ভি. রমনের সহকারী হিসাবে ডাঃ কৃষ্ণান 'আলোক-বিকিরণ' (Scattering of light), দৃষ্টি-সম্পকিত আণবিক আলোকবিজ্ঞান (Molecular optics ), ও 'রমন-ফল' (Raman Effect) সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ঢাকায় ও কলিকাতায় সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে তিনি 'স্ফটিকের চৌম্বক উপাদান' (Magnetic properties of Crystals) সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং এই গবেষণার ফল 'Transaction of the Royal Society of London' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। তিনি ও তাঁহার সহকারিগণ 'স্ফটিকের দৃষ্টিগ্রাহ্য আলোক উপাদান' ( Optical properties of Crystals ) ও 'রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে স্ফটিকীকরণ' (X-ray Crystallography) সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারসতে অনুষ্ঠিত আলোক-প্রভা (Photo-Luminescence) সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানে আহূত হইয়া ডাঃ কৃষ্ণান প্রথম ইউরোপ পরিদর্শন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যাপকভাবে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি লণ্ডনস্থ রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে, কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরিতে ও বহু গবেষণা-কেন্দ্রে বক্তৃতা দেন। তিনি লীজে (Lidge) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদক প্রাপ্ত হন। 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট ফর ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন' এর আমন্ত্রণক্রমে তিনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইউরোপ পরিদর্শন করেন এবং চৌম্বকশক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে তিনি

রয়াল সোসাইটির কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার আধুনিক ধারা পর্যবেক্ষণার্থে ইউরোপ ও আমেরিকা এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় যুক্তরাজ্য পরিদর্শন করেন। তিনি 'ন্যাশন্যাল একাডেমি অফ সায়েন্স অফ ইণ্ডিয়া' ও ভারতীয় কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার ( মাদ্রাজ, ১৯৪০ ) ভূতপূর্ব সভাপতি।

# প্রশান্ত মহালানবীশ

প্রশান্তচন্দ্র ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন। ঐ বৎসরই তিনি কেম্ব্রিজে কিংস্ কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ট্রাইপসের দুই বিভাগে ( অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা ) উত্তীর্ণ হন। এই কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে সিনিয়র রিসার্চ বৃত্তি দেওয়া হয়। তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ-



বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গবেষণার জন্য তিনি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের ওয়েল্ডন পদক প্রাপ্ত হন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটির সদস্য নিযুক্ত হন।

তাঁহার প্রধান কীর্তি ভারতে প্রথম পরিসংখ্যান ( Statistical ) ইন্স্টিটিউট স্থাপন। তিনি ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান-বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের

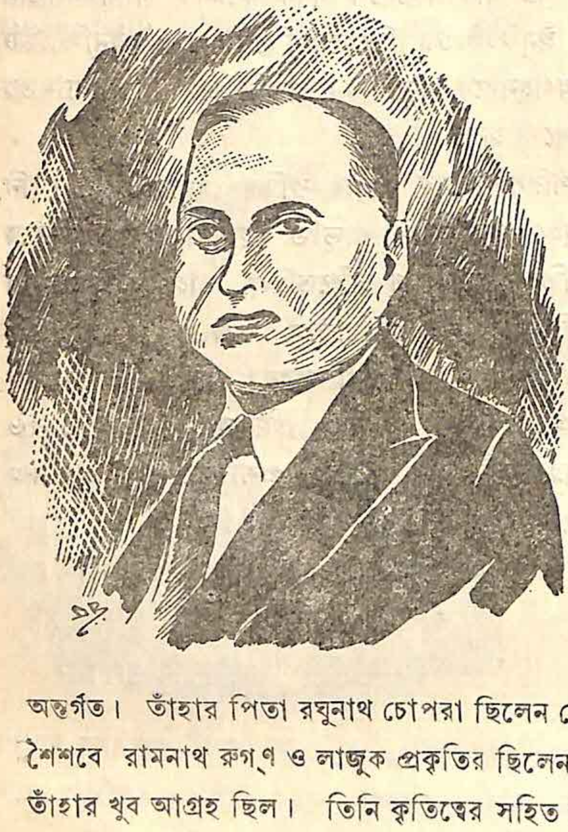
কাজ করেন। তাঁহার পরিসংখ্যান সম্বন্ধে গবেষণা খুব প্রশংসা অর্জন করে। ভারতে তিনিই এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন। তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান-গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নয় বার বিদেশে গমন করেন। দীর্ঘদিন তিনি ভারতীয় পরিসংখ্যান ইন্‌স্টিটিটের ডিরেক্টর ছিলেন। এই ইন্‌স্টিটিউট কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে অবস্থিত। তিনি এই পরিসংখ্যানতত্ত্ব কার্যকর করিবার জন্য সচেষ্ট হন।

প্রশান্তচন্দ্র কেবল পরিসংখ্যানেই তাঁহার কৃতিত্ব দেখান নাই, তিনি রাজা রামমোহন রায় হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহামনীষিগণের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ চলিতেছিল, তাহাতে নানাভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন জৈন দ্বন্দ্ববাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়াটিও প্রায় তাঁহারই রচনা। এই খসড়া তিনি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের নিকট পেশ করেন। প্রশান্তচন্দ্র যে আধুনিক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অন্যতম, তাহা অনস্বীকার্য।

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই কৃতী বৈজ্ঞানিক পরলোক গমন করিয়াছেন।

## রামনাথ চোপরা

আমাদের দেশে আয়ুর্বেদীয়, হেকিমী ও অন্যান্য দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে। কিন্তু এই প্রণালীগুলি উপযুক্ত চর্চার অভাবে আধুনিক যুগোপযোগী হয় নাই। যে বৈজ্ঞানিক এই দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর ও দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেশের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, তিনি হইলেন রামনাথ চোপরা।



রামনাথ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে গুজরানওয়ালা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহর অধুনা পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্গত। তাঁহার পিতা রঘুনাথ চোপরা ছিলেন দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান। শৈশবে রামনাথ রুগ্‌ণ ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু পড়াশুনার প্রতি তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল। তিনি কৃতিত্বের সহিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং সেই বৎসর উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান।

রামনাথ কেম্ব্রিজ ডাউনিং কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ছয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানে ট্রাইপস, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এম. আর. সি. পি., এম. আর. সি. এস. (ইংলণ্ড) এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এম. বি., বি. সি. এইচ. (ক্যান্টাব.) উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক ডিক্সনের গবেষণাগারে যোগদান করেন

এবং জীবদেহের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া ও তাহাদের ভেষজ গুণ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া প্রশংসা অর্জন করেন। বিজ্ঞানের এই শাখাকে ফার্মাকোলজি ( Pharmacology ) বলে। 'শ্বাসযন্ত্রের উপর ভেষজের ক্রিয়া' নামক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি 'ডক্টর অব্ মেডিসিন' উপাধি লাভ করেন।

কেম্ব্রিজে অবস্থানের সময়ে রামনাথ বিখ্যাত 'সেন্ট বার্থালমিউ' হাসপাতালে যোগ দেন।

রামনাথ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগিতামূলক আই. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তৎপরে তিনি সামরিক বিভাগে মেডিক্যাল অফিসাররূপে নিযুক্ত হন এবং পূর্ব আফ্রিকা ও আফগান যুদ্ধে যোগদান করেন। এই পদে সামরিক বিভাগে তিনি প্রায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। কিন্তু গবেষণার প্রতি তাঁহার আগ্রহ থাকায় তিনি সামরিক বিভাগের চাকরি ছাড়িতে মনস্থ করিলেন।

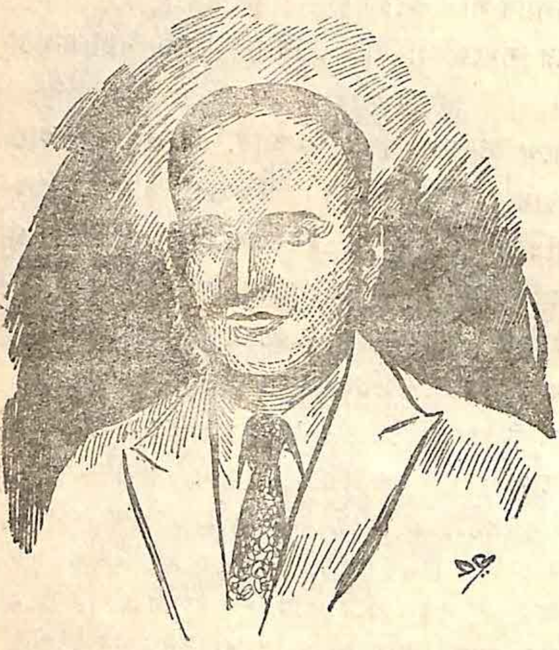
কলিকাতায় 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন' স্থাপিত হইলে রামনাথ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফার্মাকোলজির অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের পদ লাভ করেন। এই সময় তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজির অধ্যাপক পদেও কাজ করেন। তিনি এই সকল পদে প্রায় বিশ বৎসর একাদিক্রমে কাজ করিয়া ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি কাশ্মীর সরকারের অধীনে মেডিক্যাল ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ভারত সরকার তাঁহার উচাঙ্গ গবেষণার জন্য তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রামনাথের গবেষণার বিষয়বস্তুকে চারিভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) দেশীয় ঔষধসমূহের উন্নতিসাধন করা; (খ) ভারতীয় ভেষজশাস্ত্র বিধিবদ্ধভাবে প্রণয়ন করা। (গ) আয়ুর্বেদীয়, হেকিমী ও অন্যান্য দেশীয় চিকিৎসাপ্রণালীর বর্তমান চিকিৎসাপ্রণালীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। (ঘ) চিকিৎসার ব্যয়ভার হ্রাস করা।

রামনাথকে 'ভারতীয় ফার্মাকোলজির পিতা' বলা হয়। তিনি ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক 'ভেষজ-অনুসন্ধান কমিটির' সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি মনোনীত হন। তাঁর বহু ছাত্র ভারতময় ছড়াইয়া রহিয়াছেন।

## এম. এস্. কৃষ্ণন

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় মহারাজপুরম্ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে কৃষ্ণন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পুরা নাম মহারাজপুরম্ সীতারাম কৃষ্ণন। বিদ্যার্জনে তিনি বরাবরই খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে



কৃষ্ণন প্রশংসার সহিত ভূবিদ্যায় অনার্স লইয়া বি. এস.-সি. পাস করেন এবং প্রায় দুই বৎসর ঐ কলেজেই ডিমন্স্ট্রেটরের কাজ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃত্তি পাইয়া বিলাতে যান এবং লণ্ডনে 'ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে ( বর্তমান 'রয়্যাল কলেজ অব্ সায়েন্সে') ভর্তি হন। এই কলেজ হইতে তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এ. আর. সি. এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডি. আই. সি. উপাধি লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে কাথিয়াবাড়ের প্রস্তর সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. উপাধি পান। এই কলেজ হইতে তিনি ভূ-বিদ্যায় খনিতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ কৃষ্ণান ভারতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৯৩৩-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূ-বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন এবং ঐ সময়ে জিওলজিক্যাল সার্ভে ও মিউজিয়ামের কিউরেটারের কার্যভারও গ্রহণ করেন।

১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা পরিভ্রমণ

করেন এবং ভূ-বিদ্যায় প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসিলে ভারত সরকার তাঁহাকে কয়লাখনি কমিটির সভ্য নিযুক্ত করেন। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভের সহকারী ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইন্‌সের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই গৌরবময় পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত রয়্যাল সোসাইটি এম্পায়ার সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে তিনি ভারতের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে ইউরোপ ও আমেরিকার ভূ-তত্ত্ব-সম্পর্কিত কর্মপদ্ধতি-পরিদর্শনের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিরূপে পাঠান। তিনি ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ধাতু-নিষ্কাশনে ব্যবহারোপযোগী কয়লা-সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। এই সম্পর্কে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লেক সাক্‌সেসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ভূ-বিদ্যাশাখার সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্সে'র সভ্য মনোনীত হন। তিনি ভারত, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ভূ-বিদ্যা, খনিতত্ত্ব, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন।

কৃষ্ণন্ কেবল অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও রহস্যালাপের দ্বারা সহজেই সকলের হৃদয় জয় করিতেন। নেহ্‌রুজী নিজেই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত কৃষ্ণনের যতবারই সাক্ষাৎ হইয়াছে, ততবারই তিনি কৃষ্ণনের নিকট একটি করিয়া নূতন গল্প শুনিয়াছেন। কৃষ্ণনের ষষ্টিতম জন্মদিনে নেহ্‌রুজী বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণন্ কেবল একজন বৈজ্ঞানিকই নন, তিনি একজন নিখুঁত নাগরিক, একটি সমগ্র মানুষ, এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

# হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

মহাশূন্য হইতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন মৌলিক কণিকা বিদ্যুৎ-আবিষ্ট হইয়া বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে পৃথিবীতে আসে এবং আলোকরশ্মির আকারে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে



মহাজাগতিক রশ্মি বা ব্যোম-রশ্মি (Cosmic Ray) বলে। এই সমস্ত কণিকা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার সময় নানা রকম সংঘাতের ফলে নিউট্রোন, প্রোটন ও মেসন নামক কণিকায় পরিণত হয়। এই মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা জগতের অনেক রহস্য-উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলিতেছে। যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা করিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছেন, তিনি হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা।

ভাবা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত পার্শি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ মহাশূর রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহার পিতা বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান-মন্দিরে টাটা কোম্পানির একজন প্রতিনিধি ছিলেন। ভাবা বোম্বাই

শহরে প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করিয়া মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যান। সেখানে তিনি কেম্ব্রিজের গন্‌ভিল ও কায়াস কলেজে ভর্তি হন। এক বৎসর পরে তিনি গণিতে ট্রাইপস (প্রথম অংশ) পাস করেন। অতঃপর তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই বিষয়ে ট্রাইপস (দ্বিতীয় অংশ) পাস করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছুটির অবসরে একটি বৃটিশ ফার্মে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজে শিক্ষানবিশী করেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডিগ্রী লাভ করিবার পর ভাবা গাণিতিক বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেন। অধ্যাপক ডিরাক ও মটের অধীনে দুই বৎসর তিনি আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।

বিলাতে অবস্থানকালে ভাবা একাধিক কলেজে বৃত্তি পান। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ট্রিনিটি কলেজ হইতে উচ্চ গণিত-শিক্ষার জন্য রাউজ বল ট্র্যাভেলিং স্টুডেণ্টশিপ পান। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জুরিকে অধ্যাপক পাউলির নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি উচ্চশ্রেণীর একটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমে অধ্যাপক ফার্মির অধীনে ও উট্রেক্টে অধ্যাপক ক্রামারের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোপেনহেগেনে অধ্যাপক নীল বোরের পদার্থ-বিজ্ঞানের বিখ্যাত গবেষণাগারে কাজ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিন বৎসরের জন্য আইজাক নিউটন স্টুডেণ্টশিপ পাইয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিন বৎসরের জন্য রয়্যাল একজিবিশন স্কলারশিপ পান। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানলাভ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাবা কেম্ব্রিজে উচ্চবিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। যথা:—মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ, আণবিক পদার্থ-বিজ্ঞান, কোয়াণ্টাম গতিবিদ্যা ইত্যাদি।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সবার্নের আমন্ত্রণে ভাবা এডিনবরায় গিয়া মহাজাগতিক রশ্মি-বিকিরণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন

রয়্যাল সোসাইটি ম্যান্‌চেস্টারে অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক হিসাবে কাজ করিবার জন্য তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য করে। তারপর তিনি স্বাধীনভাবে কেম্ব্রিজ ও ম্যান্‌চেস্টারে উক্ত বিষয়ে গবেষণা করেন। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। তখন হইতেই তিনি বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভাবা বিলাতের এফ. আর. এস. উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণার জন্য এডাম্‌স্ পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই বৎসরই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিদ্যা-শাখার সভাপতি এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে টাটা ইনস্টিটিউট গবেষণাগার স্থাপিত হয়। তিনি প্রথম হইতেই এই ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি ভারতীয় আণবিক গবেষণা কমিটি ও আণবিক শক্তি গবেষণা পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার আণবিক শক্তি কমিশন স্থাপন করেন এবং প্রথম হইতেই তিনি এই কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত 'প্যান ইণ্ডিয়ান ওশেন অ্যাসোসিয়েশন'-এর দ্বিতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেন।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই তারিখে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মানবজাতির কল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই আগস্ট হইতে জেনেভায় বিশ্বের পরমাণু-বিজ্ঞানীদের যে মহাসম্মেলন আরম্ভ হয়, তাহাতে ভাবা মূল সভাপতির পদে বৃত হইয়া যোগদান করেন। পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিক অবদানের জন্যই বিশ্ববিশ্রুত অন্যান্য পরমাণু-বিজ্ঞানী থাকিতেও তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হয়।

ভারতের পারমাণবিক শক্তির গবেষণা তাঁহার পরিচালনাধীনে চলিতে থাকে এবং দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। ভারতের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে একটি বিমান দুর্ঘটনায় তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়।